# দেশবন্ধু-কথা

অধ্যাপক

শ্রীজিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ.

লিখিত ভূমিকা-সংবলিত

ওরিয়েণ্টাল্ সেমিনারির ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক

শ্রীসত্যকিঙ্কর বিশ্বাস-সম্পাদিত

Calcutta

S. C. AUDDY & CO., BOOKSELLERS & PUBLISHERS

58 & 12, WELLINGTON STREET

1925

Twelve Annas

# নিবেদন

---
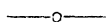
যিনি দেশবাসীর নিকট **দেশবন্ধু** আখ্যা পাইয়াছেন, ত্যাগে, নিষ্ঠায়, কর্ম্মসাধনে যিনি এখনকার যুগে সকল মানুষের শ্রেষ্ঠ ছিলেন, দেশের কল্যাণের জন্য যিনি জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার জীবনের কতক জ্ঞাতব্য বিষয় যাহাতে আমাদিগের সুকুমারমতি বালকবৃন্দ জানিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে **দেশবন্ধু-কথা** প্রকাশিত হইল। ইহাতে সেই মহাপুরুষের উদ্দেশে বাঙ্গালার বর্ত্তমান সুলেখকগণের লিখিত, কিশোর-হৃদয়ের উপযুক্ত, সুন্দর সুন্দর আখ্যায়িকা ও সুললিত কবিতাবলী সন্নিবেশিত হইয়াছে। এখন এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি বালকগণের উপযুক্ত বিবেচিত হইলে সকল শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক মনে করিব।

এই পুস্তকের অধিকাংশ রচনা বঙ্গবাণী, বসুমতী, ভারতবর্ষ, মানসী ও মর্ম্মবাণী, নবযুগ, অর্চ্চনা, বিজলী, লেখা, ফোয়ারা, গল্প-লহরী প্রভৃতি সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাদের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট এই ঋণের জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম।

প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী, প্রাতঃস্মরণীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ. মহাশয় এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমাকে উৎসাহিত ও অনুগৃহীত করিয়াছেন।

কলিকাতা,
৬৯ মির্জাপুর ষ্ট্রীট্,
১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৩২

শ্রীসত্যকিঙ্কর বিশ্বাস

# ভূমিকা।

—:০:—

দেশবন্ধুর চরিত্র কথা যতই আলোচিত হয় ততই মঙ্গল—কারণ তাঁহার অন্তরে যে শক্তি, মহত্ত্ব ও বিশালতা ছিল তাহা মনুষ্য-জীবনে সাধারণতঃ দুর্লভ, যুগ-যুগান্তের পরে ক্বচিৎ কোনও ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের জীবনে তাহা পরিলক্ষিত হয়। আমাদের মত বিজিত, পরাধীন, হৃত-গৌরব জাতির মধ্যে যে সেরূপ পুরুষসিংহ উঠিতে পারেন তাহা কল্পনা করাই যেন এক রকম ধৃষ্টতা। কিন্তু ভগবানের কৃপায় এই অসম্ভবও সম্ভব হইয়া গেল—আমাদেরই চক্ষুর সম্মুখে চিত্তরঞ্জনের ন্যায় একটা বিরাট পুরুষ ভাস্বর জ্যোতিষ্কের মত বাঙ্গালা দেশের গগন উদ্ভাসিত করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই মিলাইয়া গেলেন। তিনি চলিয়া গেলেন বটে, কিন্তু তাঁহার শেষ দান, তাঁহার পুণ্যস্মৃতিটুকু, আমাদের মধ্যে রাখিয়া গেলেন, এবং সে স্মৃতির যতই আলোচনা হয় ততই আমাদের দেশ এবং জাতির পক্ষে কল্যাণের কারণ হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি চিত্তরঞ্জনের জীবনী নহে। চিত্তরঞ্জনের সমগ্র জীবন-চরিত লিখিবার সময় এখনও আসে নাই, বোধ হয় তাহা লিখিবার যোগ্যতাও অল্প লোকের আছে। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের বিরাট মানবতার নানাদিক্ ছিল। নানাদিক্ হইতে নানা ভক্ত নানাভাবে তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন এবং তাঁহার

মৃত্যুর পর অনেকেই তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য অর্পণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান গ্রন্থকার সেই বিরাট অর্ঘ্য-স্তূপের মধ্য হইতে কয়েকটি পুষ্প আহরণ করিয়া একটি সাজি তৈয়ার করিয়াছেন। আমার বিশ্বাস তাঁহার শ্রম সফল হইয়াছে। এই সঙ্কলন পুস্তকখানি বড়ই উপাদেয় ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। ইহাতে দেশবন্ধুর বাল্যজীবন হইতে শেষ বয়স পর্য্যন্ত বহুদিনের নানা বিচিত্র কাহিনী সমাবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বত্র বিদ্যালয়ের ছাত্র-গণের মধ্যে ইহার সম্যক্ আদর হইতে দেখিলে আমি অত্যন্ত সুখী হইব। গ্রন্থকারের অনুরোধে আমি বিশেষ আগ্রহের সহিত এই ক্ষুদ্র ভূমিকা লিখিয়া দিলাম।

যিনি প্রকৃত বড়লোক, কেবল গুণগান করিলে তাঁহার সম্মান করা হয় না। চারিদিক্ হইতে সমগ্রভাবে তাঁহাকে বুঝিতে চেষ্টা করিলেই তাঁহার যথার্থ শ্রদ্ধা করা হয়। দেশবন্ধুকেও এইরূপ ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে, তাঁহার মানবত্ব ও মহত্ত্বের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইবে, তবেই তাঁহার প্রতি দেশবাসীর যে বিপুল শ্রদ্ধা তাহা সম্যক্ বিকাশ লাভ করিবে।

১৯১৬ সাল হইতে ১৯২১ সাল পর্য্যন্ত রাজনৈতিক জীবনে আমি দেশবন্ধুর সহকর্ম্মী ছিলাম, অত্যন্ত নিকট হইতে তাঁহাকে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম; আমাদের কয়েক জনের ঐকান্তিক আগ্রহে ও চেষ্টায় বোধ হয় তিনি প্রথমে ঘনিষ্ঠ ভাবে রাজনীতি-ক্ষেত্রে মিশিতে আরম্ভ করেন। তাই এই কয়েক বৎসরের আলাপে তাঁহার চরিত্রের যে বিশেষত্ব দেখিয়াছিলাম তাহার দুই একটি কথা এখানে বলিব।

১

১৯২০ সালের মার্চ কিংবা এপ্রিল মাসে কাশীধামে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হয়। তখনও মহাত্মার অসহযোগ-নীতি সাধারণের মধ্যে তেমন ভাবে প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয় নাই। কংগ্রেস অসহযোগ-ব্রত গ্রহণ করিবেন কি না, ইহাই এই সভার আলোচ্য বিষয় ছিল। বাঙ্গালা দেশ হইতে বিপিন বাবু, আমি, শ্রীযুক্ত কামিনী চন্দ প্রভৃতি কয়েকজন এই সভায় উপস্থিত ছিলাম। দেশবন্ধু তখন ডুমরাওঁর রাজের মোকদ্দমা করিতেছিলেন। তিনি আরা হইতে আসিয়া সভায় যোগদান করেন। কংগ্রেস কমিটির অধিকাংশ সভ্য, দেশবন্ধু ও আমরা সকলেই তখন মহাত্মার বিপক্ষে। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় অসহযোগ চলিতে পারে না ইহাই সকলের মত। লোকমান্য তিলক এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনিও অসহযোগের ঘোর বিপক্ষে। অধিকাংশের মতে অসহযোগ গ্রহণ করা হইবে না, এবং ভবিষ্যতে ইহার আলোচনাও হইবে না, এইরূপ একটি প্রস্তাব স্বীকৃত হয় হয় হইয়া উঠিল। এমন সময় দেশবন্ধু একটু ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি মহাত্মার সহিত পরামর্শ করিয়া ঠিক করিলেন যে অসহযোগ গ্রহণ করা হইবে কি না, তাহা মীমাংসা করিবার জন্য আগষ্ট কি সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় কংগ্রেস মহাসভার এক বিশেষ অধিবেশন হইবে এবং সেইখানেই এই বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবে। ফিরিবার সময়ে মোগলসরাই ষ্টেসনে দেশবন্ধুর সহিত আমার এই সকল বিষয় লইয়া আলাপ হইতেছিল। আমি বলিলাম, "আপনি অসহযোগের বিপক্ষে,

কিন্তু আপনিই আজ মহাত্মার প্রস্তাব পাস করাইয়া দিলেন।” দাশ মহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “অসহযোগের বিরুদ্ধে হইলেও আমার মহাত্মার উপর খুব ভক্তি, আর Mahatma can't bear a defeat (মহাত্মা হার স্বীকার করিতে পারেন না)।

কথাটা মহাত্মার সম্বন্ধে খাটে কিনা জানি না, বরং দেখিতে পাইতেছি যে মহাত্মাজী হার মানিয়া লইতে খুব প্রস্তুত, যেন হারিতে পারিলেই খুব খুসী; কিন্তু কথাটা চিত্তরঞ্জনের সম্বন্ধে যে বর্ণে বর্ণে খাটে সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কোন বিষয়ে হারিতে হইবে, তা সে মোকদ্দমাতেই হউক, আর কংগ্রেস, কাউন্সিলের ব্যাপারেই হউক, একথা তিনি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেন না। হারের সম্ভাবনা দেখিলেই উত্তপ্ত ও অসহিষ্ণু হইয়া পড়িতেন। শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিয়া লড়িতেন এবং প্রায়ই দেখিতাম, হারকে জিত করিয়া ছাড়িতেন। ১৯২৩ সালের কাউন্সিল-নির্ব্বাচনের ব্যাপার এই বিষয়ের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কাউন্সিলে ঢুকিতে হইবে এই ঠিক করিয়া দেশবন্ধু যখন স্বরাজ্য দল গঠন করিলেন, তখন নির্ব্বাচনে তিনি জয়লাভ করিবেন একথা কেহ কল্পনাতেও আনে নাই। খবরের কাগজে আঁক কষিয়া লোকে দেখাইয়া দিল, দেশবন্ধু কিছুতেই জিতিতে পারেন না। কিন্তু বাহির হইতে যত বাধা পাইতে লাগিলেন দেশবন্ধুর ততই জেদ বাড়িয়া যাইতে লাগিল। হাতে টাকা নাই অথচ নির্ব্বাচন ব্যয়-সাপেক্ষ ব্যাপার। কিন্তু এমনিই জেদ্ যে

বিপুল ঋণ-ভারের উপর আরও ত্রিশ হাজার টাকা ঋণ করিয়া নির্ব্বাচনের খরচ চালাইতে লাগিলেন। ফল কিরূপ হইল, চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে স্বরাজ্য দল কাউন্সিলে কিরূপ প্রভুত্ব লাভ করিল, তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু এই সাফল্যের মূলে তাঁহার প্রবল ইচ্ছা-শক্তি, হার না মানিবার দিকে তাঁহার কঠোর সংকল্প।

২

তাঁহার হৃদয়ে একদিকে যেমন ছিল হার না মানিবার দৃঢ়-সংকল্প অন্যদিকে তেমনই ছিল দৃক্‌পাতশূন্য, বে-পরোয়া ভাব। লাভ লোকসান খতাইয়া দেখা তাঁহার কোনও কালে আসিত না। একটা কাজ ভাল যখন বুঝিয়াছেন তখন তাহা করিতেই হইবে, তা ফল যাহাই হউক না কেন। সকলেই জানেন যে বিপুল উপার্জ্জন করা সত্ত্বেও দেশবন্ধুর অনেক ঋণ ছিল। যখন তিনি ব্যারিষ্টারএর ব্যবসা ছাড়িয়া দিলেন তখনও তাঁহার অনেক লক্ষ টাকা দেনা। পক্ষান্তরে তখন তাঁহার ব্যবসায়ে প্রতিপত্তির পূর্ণ জোয়ার। বৎসরে বোধ হয় পাঁচ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিতেছেন। আর দুই এক বৎসর ব্যবসা চালাইলেই বোধ হয় একেবারে ঋণ-মুক্ত হইতে পারেন। কিন্তু এই দুই এক বৎসর অপেক্ষা করা তাঁহার কোষ্ঠিতে লেখে নাই। ১৯২১ সালের জানুয়ারী মাসে অসহযোগ-ব্রত গ্রহণ করিয়া যে দিন বুঝিলেন ইংরাজের আদালতে ব্যবহারাজীব সাজিয়া দাঁড়ান অন্যায়, সেই দিনই পরিণামের দিকে দৃক্‌পাতমাত্র না করিয়া অগাধ উপার্জ্জনের প্রলোভন হেলায় ত্যাগ করিয়া একেবারে রাস্তায় গিয়া

দাঁড়াইলেন। হৃদয়ের অসাধারণ ব্যাপ্তি, প্রাচুর্য্য না থাকিলে এরূপ কেহ কখনও করিতে পারে? আর এরূপ বিশালতা না থাকিলে কেহ কখনও বড় হইতে পারে?

৩

কাব্য আলোচনা করিতে করিতে তিনি অনেক সময় বলিতেন "রবিবাবুর কবিতায় প্রাণের আবেগ (passion) নাই, ইহাই উহার প্রধান দোষ।" কথাটা বোধ হয় ঠিক নয়, অন্ততঃ ইহা লইয়া তাঁহার সহিত আমার অনেক তর্ক হইত। কিন্তু তিনি কেন একথা বলিতেন তাহা কতকটা ধরিতে পারি। তাঁহার প্রকৃতি এমনই আবেগময় ছিল যে, সে আবেগের তুল্য-রূপ প্রকাশ তিনি সচরাচর কবিতায় বা সাহিত্যে দেখিতে পাইতেন না। কাজেই বর্ত্তমান যুগের বাঙ্গালা কবিতা তাঁহার কাছে passionless (ফিকে) বলিয়া বোধ হইত। তিনি প্রাণের প্রকৃত শান্তি, চিত্তের পরম সুখ পাইতেন বাঙ্গালার বৈষ্ণব কবিতায়।

৪

ব্যারিষ্টারী ব্যবসাতেও চিত্তরঞ্জনের একটা বড় বৈশিষ্ট ছিল। গুরু আইন জ্ঞানে তাঁহার অপেক্ষা বড় ব্যারিষ্টার বা উকিল কলিকাতা হাইকোর্টে অনেক ছিল, এখনও হয়ত আছে। কিন্তু এমন অসামান্য একাগ্রতা, মক্কেলের কাজকে এমন একেবারে নিজের কাজ বলিয়া জানা আর কাহারও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। মোকদ্দমায় মন বসিয়া গেলে তিনি যেন

ভূতাবিষ্টের মত খাটিতেন, তা সে টাকা পান আর নাই পান বাস্তবিক যে সকল মোকদ্দমায় তাঁহার অসাধারণ শক্তিমত্তা ও কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহার জন্য তিনি অতি সামান্য টাকাই পাইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষের মোকদ্দমাই তাঁহার পসারের প্রধান ভিত্তি, কিন্তু এই মোকদ্দমা চালাইবার সময় তাঁহাকে ধার করিয়া সংসার-খরচ চালাইতে হইয়াছিল। পুস্তকের মধ্যে অমৃতবাজার পত্রিকার মামলার উল্লেখ আছে—সে মোকদ্দমার জন্য তিনি এক পয়সাও পান নাই। অরবিন্দের মোকদ্দমার তিনি ৮ দিন সওয়াল-জবাব করিয়াছিলেন, যাহারা সে বক্তৃতা শুনিয়াছিল তাহাদের কাণে এখনও যেন উহা বাজিতেছে। এমন সুযুক্তিবদ্ধ অথচ এমন আবেগময় বক্তৃতা ভারতবর্ষের কোনও বিচারালয়ে যে কখনও হয় নাই একথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

এই সামান্য ভূমিকায় আর কোন কথা বলা চলে না। আমার বোধ হয় প্রাণের বিশালতাই ছিল চিত্তরঞ্জনের প্রধান গুণ। এই গুণেই তিনি সকলের উপর মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন। এই গুণেই তিনি এমন ভাবে লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া বাঙ্গালা দেশের বুক জুড়িয়া বসিতে পারিয়াছিলেন। এই বিশালতার নানা উদাহরণ, পাঠকগণ বর্ত্তমান পুস্তকে পাইবেন। আশা করি, তাহার আলোচনা তাঁহাদের পক্ষে মঙ্গলপ্রদ হইবে।

বিদ্যাসাগর কলেজ,<br>কলিকাতা<br>১৮শে কার্ত্তিক, ১৩৩২ } শ্রীজিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

# সূচী

## ( গদ্যাংশ )

কলিকাতার প্রথম মেয়র

# দেশবন্ধু-কথা

## প্রথম পরিচ্ছেদ

### জীবন-কথা

সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী চিত্তরঞ্জনের রাজনীতিক জীবনের অনেক কথাই বর্ত্তমান সময়ের পাঠকের জানা আছে এবং সে সম্বন্ধে তাঁহার সহিত যাঁহারা বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাঁহারাই আলোচনা করিতেছেন ও করিবেন। আমি কেবল তাঁহার জীবনের অপর দিক্ লইয়া দুইএকটী কথা বলিব।

পল্লীগ্রামে আমার জন্ম; শিশুকালে আমি পল্লীগ্রামেই থাকিতাম এবং পল্লীগ্রামস্থ বাংলা স্কুলে পড়িতাম। ভবানীপুরের সহিত কোন সম্বন্ধ ছিল না, সুতরাং চিত্তরঞ্জনের শিশুকালের কথা কিছুই বলিতে পারিব না। ইংরাজী পড়িতে ভবানীপুরের লণ্ডন মিশনরী স্কুলে আসিয়া চিত্তরঞ্জনের সহিত আমার প্রথম পরিচয়। সেও অবশ্য খুব বাল্যকালের কথা। আমি যখন বোধ হয় উক্ত স্কুলে চতুর্থ মান অর্থাৎ এখানকার ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ি, তখন চিত্তরঞ্জন প্রথম আসিয়া ঐ স্কুলে ভর্ত্তি হন। তিনি আমার ঠিক নীচের ক্লাসেই ভর্ত্তি হন।

লণ্ডন মিশনরী স্কুল সাধারণতঃ দরিদ্র বালকদিগের স্কুল। বড়লোকের ছেলে হইলেও অতি অল্পদিনের মধ্যেই চিত্তরঞ্জনের কোমল স্বভাব ও সরল ব্যবহার ক্লাসের সকল ছাত্রকেই মুগ্ধ করে। স্কুলে নবাগত বালকটির স্নিগ্ধোজ্জ্বল সৌম্য মুখখানি দেখিয়া আমারও তাহার সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছা হয়। আমি ভিন্ন-ক্লাসের ছেলে হইলেও আমার অবিলম্বে চিত্তের সহিত পরিচিত হইবার ও আলাপ করিবার বিশেষ অসুবিধা হয় নাই। তাহার কারণ, আমার স্বর্গীয় মণিকাকা। আজ কত বৎসরের পর আবার মণিকাকার কথা, মণিকাকার মুখখানি মনে পড়িতেছে। মণিকাকা ও আমি এক গ্রামের ছেলে। দুই জনেই, হাতে খড়ি হওয়া অবধিই, আমাদের গ্রামের বাংলা স্কুলে পড়িতাম এবং বরাবরই এক ক্লাসে পড়িতাম। ক্লাসের পড়াশুনায় আমরা সব চেয়ে ভাল ছিলাম এবং আমাদের মধ্যে বিশেষ সৌহার্দ্দ্য ছিল। দৈবদুর্ব্বিপাকে আমি ছাত্রবৃত্তির দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে অন্যত্র চলিয়া যাই, মণিকাকা ছাত্রবৃত্তি পাশ করেন। আবার যখন কিছুদিন পরে আসিয়া লণ্ডন মিশনরা স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হই, মণিকাকা তখন সপ্তম শ্রেণীতে পড়েন, সুতরাং তিনি ও চিত্তরঞ্জন এক ক্লাসের ছাত্র হইলেন।

চিত্তরঞ্জন ভর্ত্তি হইবার অতি অল্পদিন পরেই দেখিলাম যে মণিকাকার সহিত চিত্তের একটু বিশেষ রকমের বন্ধুত্ব জন্মিয়াছে। দুই জনে ক্লাসে ঠিক পাশাপাশি বসিতেন, দেড়টার ছুটীর সময় দুইজনে এক সঙ্গে বেড়াইতেন এবং বিকালবেলা স্কুলের ছুটী হইলে

চিত্তরঞ্জনের জন্য যে গাড়ী আসিত, সেই গাড়ীতে মণিকাকা তাহার সঙ্গে যাইতেন। ফলকথা, স্কুলে আসিয়া মণিকাকা ও চিত্তরঞ্জন তিলার্দ্ধকাল তফাৎ থাকিতেন না। এণ্ট্রান্স্ পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বেই মণিকাকার মৃত্যু হয়; কিন্তু আমি বিশেষ জানি যে, ভবিষ্যৎ-জীবনে চিত্তরঞ্জন কখন মণিকাকার কথা ভুলেন নাই।

মণিকাকা যেদিন আমাকে তাঁহার বন্ধুর সহিত আলাপ করাইয়া দিলেন, সেই দিনই আমি তাহার সহিত কথাবার্ত্তায় ও তাহার সুমিষ্ট ব্যবহারে অতীব মুগ্ধ হইলাম। ক্রমে স্কুল বসিবার আগে যতটুকু সময় পাইতাম, সেই সময়ে ও মধ্যাহ্ন-ছুটীর সময়ে আমি উহাদের সঙ্গে মিলিতাম। বিকাল বেলা আমার সহিত উহাদের আর দেখা হইত না, কারণ আমি থাকিতাম খিদিরপুরে। আমি ও চিত্তরঞ্জন একত্র হইলে আমাদের উভয়ের মধ্যে বেশীর ভাগ কবিতা লইয়া আলোচনা হইত। আমাদের কবিতার আলোচনার অর্থ, আমরা সে সময়ে আমাদের ন্যায় বালকের পাঠ্য যে কবিতা পড়িয়াছি তাহাই আবৃত্তি করিতাম এবং কোন্‌টী কেমন রচিত ও কেমন মধুর সেই সম্বন্ধেই কথাবার্ত্তা কহিতাম। চিত্তরঞ্জনের অনেক কবিতা মুখস্থ ছিল এবং আমার নিজের বোধ হয় চিত্ত অপেক্ষাও বেশী মুখস্থ ছিল। অল্প কথায় এইটুকু বলিতে পারি যে, আমি পদ্যপাঠ প্রথম ভাগের "এই ভূমণ্ডল দেখ কি সুখের স্থান" হইতে আরম্ভ করিয়া পদ্যপাঠ তৃতীয় ভাগের শেষ কবিতার শেষ ছত্র পর্য্যন্ত তখন মুখস্থ বলিতে পারিতাম। ইহা বোধ হয় আমার ছাত্রবৃত্তি স্কুলে পড়ার ফল, অথবা আমার সেই

স্কুলের পূজ্যপাদ শিক্ষকগণের প্রদত্ত শিক্ষার ফল। পুস্তকে পড়া কবিতার আলোচনা করিতে করিতে আমাদের আর এক অভ্যাস আসিয়া পড়িল। আমরা আবার নিজে নিজে ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করিলাম।

এক একদিন চিত্ত বাটী হইতে একটী কবিতা লিখিয়া আনিত এবং আমার ও মণিকাকার নিকট পড়িত, আমরা তাহার সমালোচনা করিতাম; আবার একদিন আমি একটী কবিতা লিখিয়া আনিতাম, মণিকাকা ও চিত্ত তাহার সমালোচনা করিতেন। মণিকাকা বড় লিখিতেন না, কিন্তু তিনি সমালোচক ছিলেন খুব ভাল। আমার বেশ স্মরণ আছে যে, চিত্তের প্রত্যেক কবিতাই অত্যন্ত সুন্দর, ভাবপূর্ণ ও মধুর হইত, কিন্তু আমার কবিতা সেরূপ হইত না, যদিও মণিকাকা ও চিত্ত আমার কবিতারও বিশেষ প্রশংসা করিতেন। চিত্তের রচনা যে গভীর ভাবপূর্ণ ও মধুর হইত তাহা পাঠক সহজেই অনুমান করিতে পারেন, কারণ চিত্ত তাহার মধ্য জীবনে লিখিত 'মালা,' 'মালঞ্চ,' 'সাগর-সঙ্গীত,' 'কিশোর-কিশোরী' ও 'অন্তর্যামী'-প্রমুখ অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তকে একজন প্রকৃত কবিরই পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

এইভাবে আমরা তিন বৎসর কাল বড়ই আনন্দে লণ্ডন মিশনরী স্কুলে কাটাইয়াছিলাম। চিত্তের কবিতায় রচনা-কৌশলের, মাধুর্য্যের ও ভাব-গাম্ভীর্য্যের উত্তরোত্তর উন্নতি দেখা যাইতে লাগিল। এখানে একটু কথা বোধ হয় বলা উচিত যে, আমরা কেবল কবিতা লিখিয়া বা আলোচনা করিয়া বেড়াইতাম

না, স্কুলের পড়াশুনায়ও আমরা খুব ভাল ছিলাম। আমার ক্লাসে আমি ছিলাম প্রথম এবং চিত্তদের ক্লাসে, বোধ হয় মণিকাকা প্রথম ও চিত্ত দ্বিতীয় ছিল। এখানে একটী কথা বলা উচিত। মনীষীরা বলেন, প্রত্যেক মনুষ্যেরই বাল্য-জীবনের কার্য্যকলাপে তাহার ভবিষ্য জীবনের কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়। আমি কিন্তু চিত্তের বাল্যজীবনে তাহার ভবিষ্য জীবনের কোন আভাসই বুঝিতে পারি নাই। তবে আমার বোধ হয় এ আভাস বুঝিতে পারেন তিনি, যাঁহার বুঝিবার শক্তি হইয়াছে এবং যিনি প্রকৃত জ্ঞানী। একজন বালক বোধ হয় বিশেষ বন্ধুত্ব থাকিলেও তাহার সঙ্গী ও সহপাঠী অপর বালকের বাল্য-জীবনে তাহার ভবিষ্য জীবনের কোন চিহ্ন বা লক্ষণই ধরিতে পারে না।

আমি যখন লণ্ডন মিশনরী স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ি, তখন সংসার-সমুদ্রের এক ঘোর আবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া আমাকে স্কুল ত্যাগ করিতে হয়। স্কুলের প্রত্যেক শিক্ষকেরই আমি অত্যন্ত প্রিয় ছাত্র ছিলাম বলিয়া তাঁহারা সমবেত হইয়া আমাকে রাখিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু আমাকে রাখিতে পারিলেন না, আমাকে স্কুল ত্যাগ করিতেই হইল। তবে আমার সেই স্বর্গগত শিক্ষকগণের প্রতি আমার হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা আমার জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত অক্ষুন্ন থাকিবে।

আমার স্কুল ছাড়িয়া যাইবার শেষ দিন যখন উপস্থিত হইল, তখন স্কুলের অধ্যক্ষ সেই শুভ্রকেশ, শুভ্রশ্মশ্রু, সৌম্যমূর্ত্তি,

খ্যাতনামা পাদরী জন্‌সন্ সাহেব সমস্ত শিক্ষকগণের সম্মুখে আমাকে আহ্বান করিয়া আমার হস্তে তাঁহার স্বহস্তলিখিত একখানি সার্টিফিকেট দিলেন। সেই সার্টিফিকেটখানি দিবার সময় সেই প্রশান্ত গম্ভীরমূর্ত্তি পাদরী সাহেবের চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুপূর্ণ দেখিয়া আমি নিজেও অশ্রু-সংবরণ করিতে পারি নাই। সেই সার্টিফিকেটে তিনি যে কয়টী কথা লিখিয়াছিলেন তাহা এখানে বলিবার স্থান নহে, তবে আমি তাহার একটী বর্ণও এ জীবনে ভুলিব না। সেই দিন স্কুল হইতে বিদায় হইয়া আসিবার সময় আমি আর একজনের চক্ষে জল দেখিয়াছিলাম—সে চিত্তরঞ্জনের। সেই দিন আমার স্কুলের ছাত্রজীবনের শেষ হইল এবং চিত্তরঞ্জনের সহিত দেখাশুনাও প্রায় শেষ হইল।

অতি অল্প বয়সেই ছাত্রজীবন ত্যাগ করিয়া আমি অন্য জীবন অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলাম। ইহার প্রায় একবৎসর পরে চিত্তরঞ্জনের সহিত আমার একদিন সাক্ষাৎ হইল। চিত্তরঞ্জন বোধ হয় সন্ধান লইয়াই গড়ের মাঠের ভিতরে আমার প্রাত্যাহিক গন্তব্য পথের এক পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়া আমারই প্রতীক্ষা করিতেছিল। চিত্তরঞ্জন বলিল, "আমি এখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িতেছি, আর এণ্ট্রান্স্ ক্লাসে না পড়িয়া এই বৎসরই প্রাইভেট ছাত্র হইয়া এণ্ট্রান্স্ পরীক্ষা দিব সংকল্প করিয়াছি। তুমিও ত তাই দিতে পার, তুমি যাহা শিখিয়াছ তাহাতেই তোমার হইবে, আর পড়িবার আবশ্যকতা নাই।" এতদিন পরে চিত্তরঞ্জনের এত চেষ্টা করিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ ও আমাকে ঐ কয়টী কথা বলায় তাহা আমার হৃদয় স্পর্শ করিল। আমার মনে মনে

ঐরূপ সংকল্প ছিল, সুতরাং চিত্তের কথায় আমি স্বীকৃত হইলাম। তাহার পর আর দুজনে দেখাসাক্ষাৎ হয় নাই। ইহা বোধ হয় আমারই দোষ; কিন্তু আমার এ দোষ স্বভাবজাত। ইহা আমি জীবনে কখনও সংশোধন করিতে পারিলাম না।

যথাসময়ে টেস্ট্ পরীক্ষা দিবার জন্য কলিকাতার স্কুল-ইনস্পেক্টর আফিসে দুইজনেই উপস্থিত হইলাম। দুইজনের আবার সাক্ষাৎ হইল। দুইজনে পাশাপাশি বসিয়া পরীক্ষা দিলাম। বোধ হয় দুই দিন বা তিন দিন দুইজনেরই উক্ত আফিসে যাইতে হয় এবং সমস্ত দিন বসিয়া প্রশ্নোত্তর লিখিতে হয়। যাহা হউক যথাসময়ে আমরা এণ্ট্রান্স্ পরীক্ষা দিবার অনুমতি পাইলাম এবং পরীক্ষা দিলাম। সে বৎসর ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে আদৌ পরীক্ষা হইল না, নূতন নিয়মানুসারে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে হইল। প্রত্যহ প্রাতঃকালে কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া এক একটী বিষয়ের প্রশ্নোত্তর লিখিতে হইত, এইভাবে পরীক্ষা চলিল নয় দিন।

আমি আসি এক দিক্ হইতে, চিত্ত আসে অপর দিক্ হইতে; সুতরাং অবসর মত দেখাসাক্ষাতের কোনই সম্ভাবনা ছিল না। তবে প্রত্যহ পরীক্ষা-মন্দির হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় আসিয়াই সংস্কৃত কলেজের পার্শ্বস্থ রাস্তার উপর আমার সেই স্নেহময় শিক্ষকদ্বয় স্বর্গীয় রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে দেখিতে পাইতাম। তাঁহাদের আহ্বানে আমাকে ও চিত্তকে তাঁহাদের সম্মুখে প্রত্যহই উপস্থিত হইতে হইত। তাঁহারা প্রশ্নোত্তর সম্বন্ধে আমাদের দু'একটী কথা জিজ্ঞাসা

করিয়া মস্তক স্পর্শপূর্ব্বক আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেন এবং তাহার পর আমরা আপন আপন গন্তব্য পথে চলিয়া যাইতাম।

এই এণ্ট্রান্স্ পরীক্ষার শেষ দিনের পর হইতে চিত্তরঞ্জনের বিলাত যাওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আর আমাদের সাক্ষাৎ হয় নাই। কিন্তু যথাসময়ে পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইবার পর দিনই আমি চিত্তরঞ্জনের একখানি পত্র পাই। সে পত্রে চিত্ত বড় মিষ্ট ভাষায় তাহার হৃদয়ের আনন্দ জ্ঞাপন করিয়াছিল। আমি অবশ্য এই পত্রের উত্তরে চিত্তের কৃতকার্য্যতায় আমার আনন্দ ও চিত্তের প্রতি আমার হৃদয়ের প্রীতি জ্ঞাপন করিয়াছিলাম।

চিত্ত প্রেসিডেন্সী কলেজে এফ্. এ. পড়িতে গেল, আমি যেখানে ছিলাম সেইখানেই রহিলাম। কলেজে পড়া আমার ভাগ্যে না থাকিলেও ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে যথাসময়ে আমি এফ্. এ. পরীক্ষায় উপস্থিত হইয়াছিলাম। চিত্তও পরীক্ষা দিয়াছিল। যদিও এই দুইবৎসরের মধ্যে একদিন এক মুহূর্ত্তের জন্যও উভয়ের দেখাসাক্ষাৎ হয় নাই, তথাপি যথাসময়ে পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হওয়ার পরই চিত্তের আনন্দজ্ঞাপক ঠিক পূর্ব্বের মত একখানি পত্র পাই। আমিও যথাসাধ্য তাহার অনুরূপ জবাব দিই।

আবার দুইবৎসর কাটিয়া গেল। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে যথাসময়ে আমি বি. এ. পরীক্ষা দিলাম। কোন কারণে চিত্ত এইবার বি. এ. পরীক্ষা দিতে পারে নাই, কিন্তু পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইলেই আমি সফলমনোরথ হইয়াছি দেখিয়া চিত্ত আমাকে যে পত্রখানি লিখিয়াছিল, তাহার অনুরূপ পত্র এজীবনে আমি

মা-বাপ

মাতা নিস্তারিণী দেবী ও পিতা ভুবনমোহন দাশ

জননীর ক্রোড়ে চিত্তরঞ্জন

কাহারও নিকট পাই নাই। আমি তৎক্ষণাৎ চিত্তর প্রতি আমার হৃদয়ের প্রীতি ও কৃতজ্ঞতাব্যঞ্জক একখানি উত্তর দিয়াছিলাম। আমার কতবার ইচ্ছা হইয়াছিল, একবার চিত্তর বাটী আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করি; কিন্তু তাহা করি নাই। আমার এ দোষের কথা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বড় দুঃখের বিষয় যে, উল্লিখিত তিনখানি চিঠির একখানিও আমি আজ খুঁজিয়া পাইলাম না। যদি তার একখানিও আজ আমি বাহির করিতে পারিতাম তাহা হইলে তাহা হইতেই পাঠক চিত্তরঞ্জনের বাল্য-হৃদয়ের কোমলতা, মধুরতা ও উচ্চতার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইতেন। পর বৎসর ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে চিত্তরঞ্জন বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় এবং বোধ হয় সেই বৎসরেই বিলাত-যাত্রা করে।

আমি ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ওকালতী পরীক্ষায় পাস করিয়া ঐ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হাইকোর্টে প্রবেশ করি এবং চিত্তরঞ্জন তাহার তিন বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ব্যারিষ্টারস্বরূপে হাইকোর্টে প্রবেশ করে। অনেকদিন পরে আবার আমাদের এই কোর্টে সাক্ষাৎ। এখন চিত্তর চেহারার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। দীর্ঘাকার বলিষ্ঠ দেহ পূর্ণাবয়ব যুবাপুরুষ—কিন্তু মুখে সেই বাল্যকালের কান্তি ও কোমলতা সমভাবেই আছে, তবে অপেক্ষাকৃত তেজব্যঞ্জক। প্রথম সাক্ষাতে সেই সুমিষ্ট হাসি ও সাগ্রহ আলিঙ্গন একেবারেই আমাকে লণ্ডন মিশনরী স্কুলের বাল্যজীবন স্মরণ করাইয়া দিল।

যাহা হউক, ব্যবহারাজীবজীবনের প্রথম দুর্দ্দশা চিত্তরঞ্জনকে বেশী দিন ভুগিতে হয় নাই; না হইবারই ত কথা। তাহার

পিতা সে-সময়ে হাইকোর্টে একজন খ্যাতনামা এটর্ণী এবং তাহার জ্যেষ্ঠতাত একজন প্রসিদ্ধ উকীল। অল্পদিনের মধ্যেই চিত্তরঞ্জনের ব্যবসায়ে উন্নতি হইতে আরম্ভ হইল। পিতা এটর্ণী হইলেও চিত্তরঞ্জন ওরিজিন্যাল সাইডে বিশেষ কাজ করিত আমার মনে হয় না। তবে হাইকোর্টের ফৌজদারী বেঞ্চে এবং মফঃস্বলে ফৌজদারী আদালতে তাহার কাজ বেশী হইল এবং তাহা হইতেই অর্থাগম।

আমিও প্রথম কয়েক বৎসর বেশীর ভাগ ফৌজদারীতে ছিলাম এবং অনেক ফৌজদারী মোকদ্দমা করিতে মফঃস্বল যাইতাম, সুতরাং চিত্তরঞ্জনের কাজকর্ম্ম লক্ষ্য করিবার আমার সুযোগ ও সুবিধা হইয়াছিল। দুইটী কথা এখানে বলা প্রয়োজন; প্রথমতঃ, চিত্তরঞ্জনের বক্তৃতা শুনিয়া কখনও কোন হাইকোর্টের জজ বা মফঃস্বলের হাকিমকে ধৈর্য্যচ্যুত হইতে দেখি নাই এবং কোন জজ বা হাকিম বা বিরুদ্ধ-পক্ষীয় উকীল বা কৌন্সলীর কথায় চিত্তরঞ্জনের কখনই ধৈর্য্যচ্যুতি দেখি নাই। দ্বিতীয়তঃ, চিত্তরঞ্জনের মুখ সর্ব্বদাই সুপ্রসন্ন থাকিত, তাহার ব্যবহারে বিরুদ্ধ-পক্ষাবলম্বী কোন উকীল বা ব্যারিষ্টারের কখনও মনঃকষ্টের কারণ হয় নাই।

ব্যারিষ্টারীতে চিত্তরঞ্জনের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি, প্রচুর অর্থাগম ও যশোবিস্তার হয়—ইহা সকলেই বিদিত আছেন। কিন্তু ইহার মূল কারণ এই যে চিত্তরঞ্জন মোকদ্দমার কাগজপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে দেখিত এবং মক্কেলের কার্য্য একাগ্রচিত্তে ও ঐকান্তিক পরিশ্রমসহকারে করিত। কয়েকটী বড় ও জটিল দেওয়ানী

মোকদ্দমায় চিত্তরঞ্জনের বিরুদ্ধ পক্ষে থাকিয়া আমি তাহার অসীম উন্নতির উল্লিখিত কয়টী গূঢ় কারণ উপলব্ধি করিয়াছিলাম। আমি বিশ্বাস করি তাহার ঐ কয়টী গুণই শেষে তাহার রাজনীতিক জীবনে তাহাকে দেশের সহস্র সহস্র শিক্ষিত ব্যক্তির শীর্ষস্থানীয় ও একচ্ছত্র নেতা করিয়াছিল।

১৯০৩ কি ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে (বৎসরটী ঠিক আমার স্মরণ হইতেছে না) আমি ও চিত্তরঞ্জন উভয়ে একটী মোকদ্দমা উপলক্ষে ধুব্ড়ী যাই। এই মোকদ্দমা উপলক্ষে আমাদের উভয়কে প্রায় তিন সপ্তাহকাল ধুব্ড়ীতে থাকিতে হয়। চিত্তরঞ্জন ছিল বিজ্নীরাজপক্ষে, আমি ছিলাম বিজ্নীরাজের বিরুদ্ধ পক্ষে অর্থাৎ গারোদিগের পক্ষে। অনেক দিনের পর আবার একত্র হইয়া এই তিন সপ্তাহকাল কি আনন্দে কাটাইয়াছিলাম তাহা মনে করিতে আমার চক্ষে জল আসে। সমস্ত দিন অবশ্য দুইজনে দুইপক্ষের মোকদ্দমার কার্য্য লইয়া থাকিতাম; কিন্তু প্রত্যহ অপরাহ্নে দুইজনে একত্র হইয়া সুন্দর সুপ্রশস্ত ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে বেড়াইতাম, আর বাল্যকালের কত কথারই আলোচনা করিতাম। আবার সন্ধ্যার পর একত্র বসিয়া প্রায়ই অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বাল্যকালের মত কবিতার আলোচনা করিতাম।

এই সময়ে আবার যেন আমাদের সেই লণ্ডন মিশনরী স্কুলের বাল্যজীবন ফিরিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু এসময়ের আলোচ্য কবিতা সেই বাল্যকালের কবিতা নহে। এসময়ের আলোচনা কেবল বঙ্গের চিরগৌরবের জিনিস বৈষ্ণব কবিগণের সুমধুর

পদাবলী লইয়া। বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলী চিত্তরঞ্জনের এক-প্রকার কণ্ঠস্থ ছিল, আমার সেরূপ ছিল না। সুতরাং এই মধুর পদাবলীর আবৃত্তি সময়ে আমি কেবলই শ্রোতা ছিলাম। বেশ বুঝিয়াছিলাম যে, বৈষ্ণব ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব এবং কৃষ্ণলীলার মাধুর্য্য চিত্তরঞ্জনের হৃদয় সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়াছে। ধুবড়ী হইতে ফিরিবার পর অনেকদিন পর্য্যন্ত চিত্তরঞ্জনের আহ্বানে তাহার বাটীতে মাঝে মাঝে সন্ধ্যার সময় কীর্ত্তন শুনিতে যাইতাম; একসঙ্গে বসিয়া কীর্ত্তন শুনিতাম। বুঝিতাম, প্রকৃত ভগবৎপ্রেম চিত্তর হৃদয় আচ্ছন্ন করিতেছে।

ক্রমে চিত্তরঞ্জনের ব্যবসায়ে উন্নতি ও অর্থাগমের বৃদ্ধি হইতে লাগিল। দেশমাতৃকার কল্যাণে চিত্তরঞ্জন একান্তরে পরিশ্রম করিতে লাগিল। শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষের মোকদ্দমা হইতে চিত্তরঞ্জনের দেশের কাজের জন্য অকাতরে স্বার্থত্যাগ আরম্ভ হইল। চিত্তরঞ্জনের স্বার্থত্যাগের সূচনা বুঝিতে গেলে, আমার মনে হয়, চিত্তরঞ্জনের পরদুঃখকাতরতা ও অনুপমেয় দানশীলতায় তাহা পাওয়া যায়। এই সময় হইতেই চিত্তরঞ্জন অপরিমেয় অর্থ উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু তাহার অপরিমেয় দানে এবং তদুপরি নিজের পরিবারবর্গের শারীরিক সুখসচ্ছন্দতার জন্য ও পরহিতে তাহা নিঃশেষিত হইতে লাগিল।

একটী কথা আমার স্মরণ হইতেছে, তাহা এখানে না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আমাদের বকুল বাগানে যে উচ্চ প্রাথমিক স্কুলটী আছে, ঐ স্কুলটীর জন্য একখানি নূতন গৃহ নির্ম্মাণ আবশ্যক হইল। প্রায় আড়াই হাজার টাকা ব্যয়

হইবে স্থির হইল। আমিই উদ্যোগ করিয়া কার্য্যটী আরম্ভ করিলাম। চিত্তরঞ্জনের নিকট কিছু বেশী সাহায্য পাইব মনে করিয়াই কার্য্য আরম্ভ করিলাম এবং চিত্তকে তাহা বলিলাম। আমি একবারমাত্র বলায় চিত্ত স্বীকৃত হইল। কিন্তু মাঝে মাঝে লোক পাঠাইয়াও যখন চিত্তর সাহায্য পাই নাই, তখন একদিন রাগ করিয়া চিত্তর বাটীতে গেলাম। রাগ ও দুঃখ করিয়া দু'চারি কথা বলিতেই চিত্ত আমার হাত ধরিয়া বসাইল এবং যাহা আমাকে দেখাইল তাহাতে আমি নির্ব্বাক হইলাম। দেখিলাম, প্রতি মাসেই চিত্তর যে কত প্রকারের দান আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। চিত্ত প্রচুর অর্থ উপায় করিলেও প্রায় রিক্তহস্ত আমি আর কিছু বলিতে পারিলাম না; তাহার সাধ্যমত সে যাহা দিবে আমি তাহাতেই সন্তুষ্ট হইব বলিয়া চলিয়া আসিলাম।

শ্রীশরচ্চন্দ্র রায়চৌধুরী

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## জীবন-কথা

ইংরাজী ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই নভেম্বর তারিখে কলিকাতা মহানগরীতে চিত্তরঞ্জন দাশ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পিতা-মাতার প্রথম সন্তান। তিনি যে বংশে জন্মলাভ করিয়াছিলেন, তাহা অতি প্রাচীন বৈদ্যবংশ। কিংবদন্তী আছে যে, এই বংশের বহুলোক পুরাকালে বাঙ্গালার কোন কোন অংশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। উদারতা, মনস্বিতা, জ্ঞান, স্বাধীনতা-প্রিয়তা প্রভৃতি যে সকল সদ্‌গুণ মানুষের থাকিতে পারে—এই সকল সদ্‌গুণ লাভ করিয়া এই প্রাচীন বংশটি বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছে।

পূর্ব্ববঙ্গে বিক্রমপুরের অন্তর্গত আড়িয়াল বিলের পার্শ্বে তেলিরবাগ নামে একটি গণ্ডগ্রাম আছে। চিত্তরঞ্জনের পূর্ব্ব-পুরুষগণ ইদানীং এই গ্রামে আসিয়াই বসবাস করিতেছিলেন। চিত্তরঞ্জনের পিতামহ কাশীশ্বর দাশ মহাশয় একজন জ্ঞানী ও প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন, এবং সেইহেতু গ্রামের সকল লোকই তাঁহাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করিত।

কাশীশ্বরের তিন পুত্র,—দুর্গামোহন, কালীমোহন ও ভুবন-মোহন। দুর্গামোহনের তিন পুত্র, পরলোকগত সত্যরঞ্জন, রেঙ্গুনের জজ জ্যোতিষরঞ্জন, ও বাঙ্গালার এড্‌ভোকেট্‌-জেনারেল

সতীশরঞ্জন। ভুবনমোহনেরও তিনটি পুত্র, চিত্তরঞ্জন, প্রফুল্লরঞ্জন ও বসন্তরঞ্জন। কালীমোহনের কোন পুত্রাদি হয় নাই, এজন্য তিনি বসন্তরঞ্জনকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। যৌবন-কালে তিন ভ্রাতাই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরবর্ত্তী-কালে কালীমোহন প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় হিন্দুধর্ম্মে ফিরিয়া আসেন। রসারোডের উপর যে বাটিটী চিত্তরঞ্জন সাধারণকে দান করিয়া গিয়াছেন, সেটি কালীমোহনেরই আবাস ছিল।

চিত্তরঞ্জনের পিতা ও পিতামহ বিপন্নের সাহায্যার্থ যথা-সর্ব্বস্ব দান করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। চিত্তরঞ্জনের পিতা ভুবনমোহন এইরূপ অত্যধিক দানের জন্য ঋণগ্রস্ত হইয়া অবশেষে দেউলিয়া আইনের আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

কলিকাতাতে থাকিয়াই চিত্তরঞ্জন বাল্যশিক্ষা সমাপ্ত করেন। এণ্ট্রান্স্ পাশ করিবার পর তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হন্ এবং উক্ত কলেজ হইতে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে সসম্মানে বি. এ. পাশ করেন। কলেজে অধ্যয়নকালে সাহিত্যে ও বাগ্মিতায় অসাধারণ প্রতিভা দেখাইয়া তিনি সহপাঠী ও অধ্যাপকগণকে বিস্মিত করিয়া তোলেন।

বি. এ. উপাধি গ্রহণ করিয়া তিনি সিভিল সার্ভিস্ পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাতে যান্। সেই সময় দাদাভাই নৌরজী পার্লামেন্টের সদস্য হইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। চিত্তরঞ্জন তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়া বিলাতে অনেকগুলি সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার বক্তৃতাগুলি এত সারগর্ভ ও সুন্দর হইয়াছিল যে, ভারতের ও বিলাতের অনেকে সেই বক্তৃতা পাঠ

করিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া উঠেন। ভবিষ্যৎ জীবনের সুউচ্চ ও সুদৃঢ় যশঃশিখরের ইহাই যেন ভূমিকামাত্র।

ইহারই কিছুদিন পরে পার্লামেণ্টের অন্যতম সদস্য মিঃ জন্ ম্যাক্লীন্ (Mr. John Maclean) ভারতের হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এক তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করেন। চিত্তরঞ্জন ইহার প্রতিবাদার্থ একদিন ইংলণ্ডপ্রবাসী সকল ভারতীয় ছাত্রকে এক সভায় আহ্বান করিয়া ততোধিক তীব্র একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার অভীপ্সিত ফল ফলিল। মিঃ ম্যাক্লীন ক্ষমা চাহিতে ও পার্লামেণ্টের সদস্যপদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

এই ঘটনার অল্পদিন পরে তিনি একটি সভায় ভারতীয় অবস্থা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য আহূত হন। এই সভার সভাপতি ছিলেন মিঃ গ্লাড্স্টোন (Mr. Gladstone). ভারতের যে হীন ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত অবস্থা তিনি বাল্যাবধি দেখিয়া আসিতেছেন, তাহা তিনি এই সভায় বিশদভাবে বুঝাইয়া বলেন। শোনা যায়, তিনি কৃতিত্বের সহিত সিভিল সার্ভিস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেও এই বক্তৃতার জন্য তাঁহার নাম শিক্ষানবিশের তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হয়।

সিভিল সার্ভিসে প্রবেশলাভ করিতে না পারিয়া চিত্তরঞ্জন 'ইনার টেম্পলে' ব্যারিষ্টারী পড়িতে আরম্ভ করেন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সসম্মানে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় সফলতা লাভ করেন। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা হাইকোর্টের বারে যোগদান করেন। সহায় না থাকিলে শক্তির

আট বৎসর বয়সে চিত্তরঞ্জন

বিকাশলাভ সকল সময়ে ঘটিয়া উঠে না। চিত্তরঞ্জনের ভাগ্যেও তাহাই ঘটিল। ব্যারিষ্টারীতে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ প্রতিভা সহায়-সম্পদ্ অভাবে রুদ্ধ হইয়া রহিল। এইরূপে ষোলটি বৎসর তিনি কষ্টে অতিবাহিত করেন। এই সময় তিনি সামান্য যাহা কিছু আয় করিয়াছিলেন, সমস্তই মফঃস্বলে ঘুরিয়া করিতে হইয়াছিল। এই কয়বৎসরের সামান্য আয় হইতে তিনি ৬৭,০০০৲ টাকা সংস্থান করিতে সমর্থ হন। ইহাই তাঁহার পিতৃ-ঋণের পরিমাণ। এই ঋণ গলিত সীসার মত দিবারাত্র তাঁহার মনে সুতীব্র বেদনা জাগাইয়া রাখিত। সুতরাং প্রথম হইতেই তাঁহার চেষ্টা ছিল, এই ঋণ পরিশোধ করা। যখন তিনি উক্ত পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইলেন, তখন পিতার উত্তমর্ণদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাঁহাদের প্রাপ্য অর্থ দিয়া দিতে লাগিলেন।

কিন্তু তাঁহার গুণের মূল্য চিরকাল অপ্রকাশ রহিল না। তাঁহার উপেক্ষিত শক্তি একটি উপলক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া স্বপ্রকাশিত হইয়া পড়িল। ইহা ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক ষড়্যন্ত্রের মামলার বিখ্যাত আসামী শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষের পক্ষ সমর্থন। অরবিন্দ ঘোষের পক্ষ সমর্থন করিয়া তিনি যে কয়টি জ্বলন্ত বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার ব্যবহার-শাস্ত্রের অসাধারণ ব্যুৎপত্তি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। শোনা যায়, এই মামলা পরিচালনায় তিনি এক কপর্দ্দক অবধি গ্রহণ করেন নাই। এই সময় সংসারের ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য তাঁহাকে তাঁহার গাড়ী-ঘোড়া পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতে হইয়াছিল। এই

ত্যাগের ফল সঙ্গে সঙ্গেই ফলিল। ব্যবহারাজীবরূপে তাঁহার যশঃ চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল। এই মামলার পর তাঁহাকে অনেক বড় বড় মামলায় নিযুক্ত করা হয় এবং তিনিও অবিলম্বে সকলপ্রকার ফৌজদারী ও দেওয়ানী মোকদ্দমায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী কাউন্সেলরূপে খ্যাতিলাভ করেন। তিনি যখন ব্যারিস্টারী কার্য্য পরিত্যাগ করেন, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে ভারত সরকার কর্ত্তৃক 'মিউনিসন্ বোর্ডের' মামলায় নিযুক্ত ছিলেন। এই সময় তিনি সহস্র সহস্র অর্থ উপার্জ্জন করিতেন।

একদিকে যেমন তিনি সহস্র সহস্র অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, অন্যদিকে তেমনই মুক্তহস্তে দান করিতেন। তাঁহার দানের অন্ত ছিল না। শত শত অন্ধ, দরিদ্র, তাঁহার অর্থে প্রতিপালিত হইত। বাঙ্গালার যুবকসমাজ তাঁহাকে ভাল করিয়াই চিনিত। যে তাঁহার নিকট যাহা চাহিয়াছে, সে তাহাই পাইয়াছে। প্রত্যহ কত সাহিত্যকার, বিদ্বান, সঙ্গীতজ্ঞ প্রভৃতি গুণী তাঁহার নিকট যাইতেন, এবং তিনি তাঁহাদের যে কোন অভাব বা অসুবিধা দূর করিতে পারিলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেন।

কাহারও হয় ত' অসুখ হইয়াছে, অর্থাভাবে বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য কোথাও যাইতে পারিতেছেন না,—চিত্তরঞ্জন সেই কথা শুনিয়াই প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ তাঁহাকে দান করিয়া দিলেন। সন্ধ্যার পর যে কেহ তাঁহার বাড়ীতে গেলে খাইয়া আসিতে হইত। ঐরূপে রাত্রিতে তাঁহার বাড়ীতে প্রায় এক শত পাতা পড়িত। সকলকে পরিতোষসহকারে ভোজন করাইয়া তিনি নিজের গাড়ী দিয়া বা অন্য ভাড়াটে

গাড়ী আনিয়া সকলকে পৌঁছাইয়া দিতেন। মিথ্যা জানিয়াও অনেক সময়ে তিনি অনেকের অভিযোগ মোচন করিয়াছেন।

তিনি যে কত বড় দানশীল ছিলেন, তাঁহার হৃদয়টি পরের দুঃখে যে কতখানি কাতর হইয়া পড়িত, সে সকলের সুবিস্তৃত আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে। তাঁহার হৃদয়টি ছিল অতুলনীয়। ঔচিত্যবোধে তিনি কোন দিন দান করেন নাই, দান করিতেন তাঁহার দান-ধর্ম্ম স্বভাবগত বলিয়া। ধনী দরিদ্র, জ্ঞানী মূর্খ, সৎ অসৎ সকলেই সমভাবে তাঁহার করুণা পাইয়া আসিয়াছে।

শ্রীবাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## মাতাপিতার প্রতি ভক্তি

### (১)

আমি তখন আলিপুরে ওকালতি করি। একদিন হঠাৎ কোন ক্লাবে শুনিলাম তিনি 'পিতৃঋণ' শোধ করিয়াছেন। দেনা শোধ দিতে না পারিয়া তাঁহার পিতা ভুবন বাবু ইন্‌সল্‌ভেণ্ট্‌ অর্থাৎ দেউলিয়া হন। সেই ঋণের কতকাংশের জন্য চিত্তরঞ্জনও ইন্‌সল্‌ভেন্‌সি লইয়াছিলেন। এই সমস্ত দেনার আর দাবী নাই। এ দেনা পরিশোধ করিতে তিনি ইংরাজের আইনতঃ বাধ্য ছিলেন না। কিন্তু হৃদয়ের ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য ৭৫,০০০৲ টাকা দেনা দিয়া পিতাকে তিনি ঋণমুক্ত করেন। জষ্টিস্‌ ফ্লেচার আন্তরিক আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলেন, "এইরূপ ব্যাপার বিলাতেও শুনা যায় নাই।"

ইহার কিছুদিন পরে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। শ্রাদ্ধের সময় পদব্রজে বাড়ী বাড়ী গিয়া তিনি নিমন্ত্রণ করিয়া আসেন। কদাচ কোন পাশ্চাত্যভাব তাঁহাকে বিপথে চালিত করিতে পারে নাই। তিনি বরাবর অন্তরে বাহিরে বাঙ্গালীই ছিলেন—হিন্দু ছিলেন।

তাঁহার অসাধারণ মাতৃভক্তিরও অনেক আখ্যান আছে। মায়ের কথায় তিনি উঠিতেন বসিতেন, প্রত্যহ মায়ের নাম লইয়া কাজ করিতে যাইতেন।

ঢাকার মোকদ্দমার দুই এক মাস পরে আমরা আর তাঁহার উপযুক্ত ফি যোগাইতে পারি নাই, কিন্তু নিজের অসচ্ছলতা সত্ত্বেও তিনি মোকদ্দমা ছাড়িলেন না। এতগুলি সোনার প্রাণের মঙ্গলামঙ্গল যে তাঁহার হস্তে ন্যস্ত, এ কথা তিনি ভুলিতে পারিলেন না। মায়ের আশীর্ব্বাদও পাইলেন, "তুই ওদের জন্য কাজ কর। অভাব থাক্‌বে না।"

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত।

(২)

বাল্যকাল হইতেই চিত্তরঞ্জন সরল ও নির্ভীক ছিলেন। সেই সময় হইতেই তাঁহার বক্তৃতাশক্তির স্ফুরণ হইয়াছিল। তাঁহার যুক্তিতর্ক অমোঘ ছিল, কেহ তাঁহাকে তর্কে পরাভূত করিতে পারিত না। দেশের জন্য তিনি যে অতুলনীয় স্বার্থত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহার পূর্ব্বাভাস তাঁহার বাল্যজীবনেই দেখিতে পাওয়া যাইত। হৃদয়ের ঔদার্য্য তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁহার পিতৃদেব ভুবনমোহনের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্রের আর একটা বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি বাল্যকাল হইতেই প্রচলিত সংস্কারের বিরোধী ছিলেন।

১৬ বৎসর ধরিয়া চিত্তরঞ্জন পিতৃঋণ পরিশোধের জন্য ভীষণ পরিশ্রম ও কঠোর কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন। ১৮ বৎসর পূর্ব্বে একদিন প্রভাতে আমি চিত্তরঞ্জনের নিকট হইতে টাকা পাইয়াছিলাম। তাঁহার পিতা আমার পিতার নিকট হইতে এই টাকা ঋণ লইয়াছিলেন। উভয়েই তখন পরলোকে। পিতৃঋণ পরিশোধের সঙ্গে সঙ্গে চিত্তরঞ্জন আমাকে একখানি পত্রও

লিখিয়াছিলেন। এই পত্র পাইয়া,আমার বিস্ময় সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। তখন আমার এই কথা মনে হইয়াছিল, "একসঙ্গে মানুষ হলাম; চিত্তরঞ্জন দেবতা হয়ে গেল, আমি মানুষও হ'তে পার্‌লাম না।" এই কথাগুলি সর্ব্বক্ষণই আমার মানসপটে সমুদিত ছিল। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

(৩)

পূজার ছুটী উপলক্ষে সে বারে তিনি বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য সমুদ্র-যাত্রা করেন—ফিরিয়া আসিয়া আর মাতাকে দেখিতে পান নাই। তিনি দেশে ফিরিবার পাঁচ সাত দিন পূর্ব্বে তাঁহার মাতা দেহত্যাগ করেন। চিত্তরঞ্জন সর্ব্বদাই মাতার অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহার মাতার মত এমন উদারমতি, স্বজনবৎসল, স্বামি-পুত্র-পরিবারের সেবানিষ্ঠ স্ত্রীচরিত্র আধুনিক হিন্দু সমাজেও বিরল। জননী মৃত্যুকালে বলিয়া গিয়াছিলেন যে, "জন্মে জন্মে যেন এই স্বামী এবং চিত্তকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হই।" তাঁহার 'চতুর্থী' উপলক্ষে আমি পুরুলিয়ায় যাই। ইহার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই ভুবন বাবু ব্যবসায় হইতে অবসর লইয়া একরূপ বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া পুরুলিয়ায় যাইয়া বাস করিতেছিলেন। এই স্থানেই চিত্তরঞ্জনের জননীর সংসারলীলা সাঙ্গ হয়। তাঁহার কন্যাগণ তাঁহার অন্তিমকালে পুরুলিয়াতে যাইয়া একত্র হইয়াছিলেন। পুরুলিয়াতেই তাঁহারা মায়ের 'চতুর্থী' করেন। ইহার পরদিনই চিত্তরঞ্জন দেশে ফিরিয়া আসেন। চিত্তরঞ্জনের মাতৃবিয়োগের পর হইতে তাঁহার ভিতরে একটা নূতন ভাবের সঞ্চার হয়। শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

## দয়া ও দান

(১)

পরের দুঃখে তাঁহার মন যেমন কাঁদিত, এমন অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। কত লোক যে তাঁহার টাকায় প্রতিপালিত হইত, বলা যায় না। দাতা বলিয়া নাম লইতে তাঁহার একেবারেই প্রবৃত্তি ছিল না। আমি একটি দৃষ্টান্ত জানি। সে অনেক দিনের কথা—দশ বার বৎসর হইবে। একজন পাড়াগাঁয়ের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নানা কারণে দেশত্যাগ করিয়া একটি মিউনিসিপ্যাল টাউনে আসিয়া উপস্থিত হন। সেখানে দুই এক বৎসর বাস করার পর তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পরিবারে তিন চারিটি লোক মহা দুরবস্থায় পড়ে। তাহারা কাহার পরামর্শে জানি না, মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস্-চেয়ারম্যানের এক পত্র লইয়া চিত্তরঞ্জন বাবুর সাহায্য চায়। তিনি বরাবর তাহাদের দশটি করিয়া টাকা পাঠাইয়া দিতেন। যিনি সাহায্য পাইতেন, তিনি বলিয়াছেন,—মাসের পহেলা তারিখে ঘড়ির কাঁটার মত টাকাটি মণি অর্ডারে তাঁহার নিকট পোঁছিত। এরূপ দান চিত্তরঞ্জনের অনেক ছিল।

খবরের কাগজে দেখিলাম, দাশ সাহেব ব্যারিষ্টারী ত্যাগ করিয়াছেন। ব্যারিষ্টারীতে তাঁহাকে কিরূপ খাটিতে হয়, তাহা আরায় গিয়া একটু দেখিয়াছিলাম এবং কিরূপ টাকা পাইতেন,

তাহাও জানিতাম। শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। দুই একবারমাত্র তাঁহার বাড়ী গেলেও, তাঁহার অসীম দানের কথা আমার বেশ জানা থাকিলেও, আমি জানিতাম, তাঁহার চালচলন খুব উঁচু অঙ্গের। চালের জন্যও তাঁহাকে অনেক খরচ করিতে হয়। সে চাল চলিবে কিরূপে ? বোধ হয় কিছু করিয়াছেন, যাহাতে অন্ততঃ চালটা বজায় থাকিবে। তাহার পর শুনিলাম, তিনি সর্ব্বস্ব সাধারণের উপকারার্থ দান করিয়াছেন, এমন কি, ভিটা বাড়ীটি পর্য্যন্ত। আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। এই সময়ে আমাদের সাহিত্য-পরিষদের পণ্ডিত মহাশয় আমায় আসিয়া বলিলেন, "শাস্ত্রী মহাশয়, দাশ সাহেব ত যথাসর্ব্বস্ব দান করিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অনেক বাঙ্গালা পুঁথি আছে। সেগুলির জন্য তিনি অনেক টাকা খরচ করিয়াছেন এবং দুই তিন বৎসর পণ্ডিত রাখিয়া সেগুলি গুছাইয়াছেন, আপনি গিয়া চাহিলে বোধ হয়, সাহিত্য-পরিষদের জন্য পাইতে পারেন।" কথাটা আমার পছন্দ হইল না। লোক সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু সৌখীন লোক সখের জিনিষ ত্যাগ করিতে পারে না। যাহা হউক, গেলাম।

আমাকে দেখিয়াই তিনি বলিলেন, "আপনি এখানে ?" আমি বলিলাম, "আমি সাহিত্য-পরিষদের দূত হইয়া আসিয়াছি।" "আমার ত এখন দিবার কিছু নাই যে, সাহিত্য-পরিষদের কোনও উপকার করিব।" আমি বলিলাম, "আমি জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি, আপনি যে অনেক যত্ন করিয়া বাঙ্গালা পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার কি ব্যবস্থা করিয়াছেন ?" তিনি

বলিলেন, "হাঁ, তা বটে, সেগুলোর ত কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই, আমিও আর পাঁচ সাত দশ বৎসর তাহার কোন ব্যবহারই করিতে পারিব না। আপনারা সেগুলি চান?" আমি হাঁ বলিলে, তিনি ডাকিলেন—"সরকার!" সে আসিলে বলিলেন, "পুঁথির আলমারীর চাবি লইয়া আইস।" চাবি আনিলে চাবিটি আমার হাতে দিলেন। আমি ত স্তম্ভিত, আর বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না। তিনিও তাঁহার অন্য কাজে মন দিলেন, আমিও খানিকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া বিদায় লইয়া আসিলাম।

সাহিত্য-পরিষদের মিটিংয়ে এই সব কথা শুনিয়া তাঁহারাও স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। দাশ সাহেবের পুঁথিগুলি স্বতন্ত্র করিয়া একটি আলমারীতে রাখার ব্যবস্থা হইল। উহার নাম হইল 'দেশবন্ধুর দান।'

দাশ সাহেবকে যাঁহারা 'দেশবন্ধু' উপাধি দিয়াছেন, তাঁহারা দাশ সাহেবকে সত্য সত্যই ভালবাসিতেন, আর বন্ধু শব্দটি ভালবাসারই চিহ্ন। দেশও তিনি ভালবাসিতেন, দেশও ভাল-বাসিয়া তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছে।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

(২)

দেশবন্ধুর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সৌভাগ্য আমার হয় নাই, সে সুকৃতি আমার ছিল না। আনুমানিক সাত বৎসর পূর্ব্বে আমি তাঁহার দুয়ারে এক দিন দাঁড়াইয়াছিলাম ভিক্ষাব্যপদেশে। তখনও দেশের লোক তাঁহাকে দেশবন্ধু বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করে নাই,

কিন্তু সকলেই বেশ জানিত যে, কোন একটা উপলক্ষ করিয়া ইঁহার নিকট হাত পাতিলে নিরাশ হইয়া ফিরিবার ভয় নাই।

আমাদের গ্রামের এক ভদ্রলোক বহুদিন ব্রাহ্মণ সমাজের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার পর প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পৌঁছিয়া হঠাৎ একদিন মহাপ্রভুর প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মে আকৃষ্ট হইলেন। দিবা-রাত্র তাঁহার বাড়ীতে কীর্ত্তন ত চলিতই, বিদেশ হইতে বহু ভক্ত-জনকে নিমন্ত্রণ করিয়া মহোৎসবে গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার বিগ্রহ স্থাপনের জন্য তিনি উৎসুক হইয়াছিলেন। কিন্তু টাকার সঙ্গতি তাঁহার ছিল না। তাই তিনি গেলেন চিত্তরঞ্জনের নিকট টাকা চাহিতে, আর একা যাইতে সঙ্কোচ বোধ হওয়ার জন্যই হউক অথবা অন্য কোন কারণেই হউক, আমাকে ও আমার আর এক-জন বন্ধুকেও যাইবার সময়ে ধরিয়া লইয়া গেলেন।

চিত্তরঞ্জনের পিতৃব্য ও পিতামহ বরিশালে ওকালতি করিয়া-ছিলেন। দুর্গামোহন দাশের নিকট বরিশাল অনেক রকমে ঋণী। কৃতজ্ঞতার কিঞ্চিৎ চিহ্নস্বরূপ বরিশালবাসী বরিশালের 'পাবলিক লাইব্রেরী'গৃহে দুর্গামোহন দাশের একখানি চিত্র টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছে। সুতরাং চিত্তরঞ্জনের প্রতি আমাদের একটা আইনসঙ্গত দাবী আমরা কল্পনা করিয়াছিলাম। জ্যাঠা মহাশয় যখন বরিশালের অনেক উপকার করিয়াছিলেন, তখন ভাইপো বরিশালের লোকদের সাধ মিটাইতে সাহায্য করিতে নিশ্চয়ই আইনতঃ বাধ্য। বিশেষতঃ চিত্তরঞ্জনও ছিলেন মহাপ্রভুর পরম অনুরক্ত ভক্ত। যাহা হউক, তাঁহার ভবানীপুরের বাড়ীতে গেলাম, দেখা পাইতেও কোন বাধা হইল না। তিনি দ্বিপ্রহরে আপনার পাঠাগারে বিশ্রাম

করিতেছিলেন, যতদূর মনে পড়ে, একটা গদি-আঁটা চেয়ারে বসিয়া স্মরতি তামাক টানিতেছিলেন। আমরা নমস্কার করিয়া তাঁহাকে আমাদের আর্জী জানাইলাম। আমাদের ক্ষুদ্র গ্রামের সেই ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য তিনি ৫০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন।

ইহার পূর্ব্বেই বিখ্যাত ব্যারিষ্টার ও সুসাহিত্যিক চিত্তরঞ্জন দাশকে দর্শন করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। ঢাকায় একটি সাহিত্য-পরিষৎ আছে, এটি একটি স্বাধীন অনুষ্ঠান; কলিকাতার বড় পরিষদের শাখা নহে। চিত্তরঞ্জন এই পরিষদের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। বার্ষিক সভার সময় সকলের আগ্রহে তিনি ঢাকায় গেলেন; নির্দ্দিষ্ট দিনে তিনি সভাপতির কার্য্যও করিলেন। সেদিনকার সভায় অনেক লোক-সমাগম হইয়াছিল। আমরা খুব বড় একটা বক্তৃতা শুনিবার আশায় সভায় গিয়াছিলাম; কিন্তু আমাদের সে আশা সফল হয় নাই। চিত্তরঞ্জন বক্তৃতা দিলেন না, দিলেন পরিষদের ভাণ্ডারে এক হাজার টাকা। কলিকাতার পরিষদের অনেক টাকা আছে, কিন্তু ঢাকার গরীব পরিষদের পক্ষে এক হাজার টাকা একটা কুবেরের ভাণ্ডার। তিনি দেশের সেবায় নিজের সর্ব্বস্ব দান করিয়াছিলেন, এই সকল ছোট দানে তাঁহার প্রাণের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে মাত্র।

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ সেন।

(৩)

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রাণ খুলিয়া দান করিতে পারিতেন, একথা কাহারও অবিদিত নহে। মহাভারতের যুগের দাতাদের মত কলিযুগে ত্যাগ ও দানে তিনি অক্ষয়-কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দানশীলতা-প্রসঙ্গে একটী ক্ষুদ্র ঘটনা সাধারণের অবগতির জন্য লিপিবদ্ধ করিলাম।

ছয় সাত বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। তখন মুক্তহস্ত দাতা বলিয়া দেশবন্ধুর খ্যাতি ছিল। এক পল্লীগ্রামবাসী দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত কন্যাদায়ে বিব্রত হইয়া দেশবন্ধুর দ্বারস্থ হ'ন। মক্কেল-পরিবৃত সেই কর্ম্মী পুরুষের সাক্ষাৎ লাভ করিতে ব্রাহ্মণকে দুই এক দিন ঘুরিতে হয়। এত কাজে ব্যস্ত থাকিতেন তিনি যে তাঁহার সময় মত সাক্ষাৎ করা অনেক সময়ে অসম্ভব হইয়া পড়িত। মোটরে উঠিয়া কাছারীতে যাইবেন এমন সময়ে একদিন ব্রাহ্মণ সাহসে নির্ভর করিয়া তাঁহার নিকট পৌঁছিলেন। নিজকার্য্যের অতি ব্যস্ততার মধ্যেও ব্রাহ্মণের আবেদন ধৈর্য্যের সহিত শুনিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিবেন আশা দিয়া দেশবন্ধু নিজকার্য্যে চলিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণ পরদিন দেশবন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ হঠাৎ পাইয়া তাঁহার নিকট গমন করিলে, দেশবন্ধু তাঁহাকে আর একদিন আসিতে বলিলেন। ব্রাহ্মণ দুই চারি দিন ঘুরিয়া আর একদিন আসিলেন, দেশবন্ধু তাঁহাকে পুনরায় আর একদিন আসিতে বলিলেন। এইরূপে প্রায় মাসাবধি কাটিলে, ব্রাহ্মণ হতাশ ও অতিষ্ঠ হইয়া পড়িলেন।

দেশবন্ধুর নিকট সাহায্য পাইবার আশা একপ্রকার ত্যাগ

করিয়া তিনি নিজের বাটীতে ফিরিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। বাড়ী ফিরিবেন, অথচ যাব কি যাবনা করিয়া আর একবার শেষবার দেখিয়া যাইতে তাঁহার ইচ্ছা হইল। সে দিনও কাছারীতে যাইবার সময় দেশবন্ধুর সম্মুখে তিনি উপস্থিত হইলেন। দেশবন্ধু তখন একটু লজ্জিত হইয়া বলিলেন—"আপনার কথা আমার স্মরণ ছিল না, আপনি অদ্য বৈকালে আর একবার অনুগ্রহ করিয়া আসিবেন।" ব্রাহ্মণ দেশবন্ধুর কথায় আস্থাস্থাপন করিতে পারেন নাই। তবু একটা আশার শেষ করিয়া যাইবেন ভাবিয়া সেদিন আর তিনি বাটী ফিরিলেন না। সমস্ত দিনই কালীঘাটে কাটাইয়া সন্ধ্যার সময় দেশবন্ধুর নিকট গমন করিলেন। দেশবন্ধু সেদিন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন ২১০০৲ টাকা। তিনি প্রাপ্ত ক্রস্ (Cross) চেকখানি নিজ নামে ব্যাঙ্কে জমা দিয়া ব্রাহ্মণের নামে ২১০০৲ টাকার একখানি বেয়ারার (Bearer) চেক নিজের ব্যাঙ্কের উপর কাটিয়া দিলেন।

ব্রাহ্মণ প্রথমটা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। পরে নিজেকে একটু সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিলেন—"এত টাকা ত আমার দরকার নাই, দাশ সাহেব। আমরা গরীব লোক। চার পাঁচ শত টাকা হ'লেই আমার সব ব্যয় সঙ্কুলান হ'য়ে যাবে। আমি আপনার কাছে ৫০৲।৬০৲ টাকা পাব আশা করে এসেছিলাম।"

দেশবন্ধু বলিলেন—"আমি সঙ্কল্প করে বেরিয়েছিলাম যে, আজ যে টাকা আমি উপার্জ্জন কর্‌ব সব আপনাকে দেব। আপনার ভাগ্যে আমি আজ যা' পেয়েছি তাই আপনাকে দিলাম।

গ্রহণ করে আমাকে ঋণমুক্ত করুন। কন্যার বিবাহে এই টাকা যদি আপনার আবশ্যক না হয়, বিবাহ-খরচা বাদে যা' অবশিষ্ট থাক্‌বে, আপনি কিছু জমি কিনে ভোগ-দখল কর্‌বেন।”

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত তখন পৈতা-জড়ান হস্ত দেশবন্ধুর মস্তকে দিয়া গদ্গদ্‌কণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, “বাবা, তুমি রাজা হও!”

আমরা এখন চর্ম্মচক্ষুতে দেখিতেছি, দেশবন্ধু সর্ব্বস্ব দান করিয়া একপ্রকার নিঃস্ব হইয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ ফলিয়াছিল কি না অর্থাৎ দেশবন্ধু রাজা হইতে পারিয়াছিলেন কিনা, সে বিচার-ভার পাঠকের উপর।

শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র।

(৪)

চিত্তরঞ্জনের জনক ভুবনমোহন ছিলেন দানশৌণ্ড। তাহারই অব্যবহিত ফলে পিতাপুত্রকে একদিন দেউলিয়া খাতায় নাম লিখাইতে হইয়াছিল। ইন্‌সল্‌ভেণ্টের আসামীদের সম্বন্ধে অনেকের মত আমাদেরও এই ধারণা ছিল যে, আসামীদের অনেকেই অতীতকালে নানান্‌-রকম ভোগ-বিলাসের কার্য্য সারিয়া এবং উত্তরকালের জন্য বেশ গুছাইয়া গাছাইয়া লইয়া, বর্ত্তমানকালে পৈতা পুড়াইয়া ভগবান্‌ সাজিয়া বসেন। আইনের কারসাজী এমনই যে, দেউলিয়া আসামীকে পাওনাদার জোর জবরদস্তি ত দূরের কথা, একটি কথাও বলিতে পায় না।

অনেকের পক্ষে ইহা পরম সুবিধাজনক হইলেও, চিত্তরঞ্জনের প্রথম জীবনে ইহা যে কতদূর ক্লেশদায়ক হইয়াছিল, বলিতে

পারা যায় না। চিত্তরঞ্জন আইন-ব্যবসায়ে মনপ্রাণ দান করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। শোনা কথা, এই সময়ে কোন কষ্টকেই তিনি কষ্ট বলিয়া মনে করেন নাই। চিত্ত-রঞ্জনের কোন প্রিয়জনের নিকটে শুনিয়াছি, এই সময়ে হাইকোর্ট আসিতে ও বাড়ী যাইতে গাড়ীভাড়া পর্য্যন্ত তিনি খরচ করিতেন না। অনেক সময় এতখানি পথ পদব্রজে আসা-যাওয়া করিতেন। এই 'আসা-যাওয়াও' আবার সাধারণ লোক-চলাচলের পথে নয়,—পাছে কেহ মোটরে অথবা গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া 'অনুকম্পা দেখায়' দৃঢ় আত্মসম্মান-জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষবর তাই মাঠের রাস্তা দিয়া, বন্ধুবান্ধবকে এড়াইয়া চলিতেন।

জীবন-সংগ্রামে ভাগ্য পুরুষকারের নিকট পরাজয় মানিতে বাধ্য হইল ; ভাগ্যদেবী স্বহস্তে বিজয়-টীকা পরাইয়া পুরুষসিংহ চিত্তরঞ্জনকে পুরস্কৃত করিলেন। যে টাকার জন্য পিতা-পুত্রকে দেউলিয়া হইতে হইয়াছিল, সেই পরিমাণ অর্থ চিত্তরঞ্জন সঞ্চয় করিয়া দায়-মুক্ত হইলেন। এই বাঙ্গালী দেনাদারের প্রতি তখনকার হাইকোর্টের জজ ফ্লেচার্ সাহেবের উক্তিটি পৃথিবীর লোকের গর্বের বস্তু হইয়া আছে। জষ্টিস্ ফ্লেচার-সাহেব বলিয়া-ছিলেন, "দেউলিয়া আসামী দেনা শোধের কোন চাপ না থাকিতেও যে এমন করিয়া স্বেচ্ছায়, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পাওনাদারের টাকা মিটাইয়া দেয়, পৃথিবীর আদালতের নজীরে ইহাই প্রথম লিপিবদ্ধ হইল।"

আইনের চাপ ছিল না, জবরদস্তি ছিল না, কাহার বলিবারও কিছু ছিল না সত্য কথা ; কিন্তু বিবেকের চাপ, ন্যায়ের জবরদস্তি,

বিলাতে ছাত্রাবস্থায়

বিলাত হইতে ফিরিবার পর

লইয়াই তাঁহাকে পর-জগতে কি কষ্ট পাইতে হইত, কে জানে! পিতাকে ঋণমুক্ত করিতে পুত্রকে কি বিষময় জীবনই না বহন করিতে হইয়াছে! আহারে রুচি নাই, বিশ্রামে শান্তি নাই—পর্ব্বতপ্রমাণ ঋণ যেন পথের সাম্‌নে অচল, অটল দুর্লঙ্ঘ্য বাধা সৃষ্টি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে! কিন্তু ধন্য সেই পুরুষকার, আর ধন্য সেই পুরুষসিংহ, পর্ব্বত যাঁহার পায়ের সম্মুখে মাথা নীচু করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

কিন্তু—এর পরেও চিত্তরঞ্জনের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। দানে-ফতুর পিতার পুত্র সাধারণ মানুষ হইলে সাবধানেই চলিতেন, অন্ততঃ নিজের উত্তরকালের, স্ত্রী, সন্তান-সন্ততির জন্য মোটা-রকম গোছ করিয়া তবে কিছু কিছু দান করিতেন। কিন্তু চিত্তরঞ্জন সাধারণ ছিলেন না; যে ভগবান্ তাঁহাকে গড়িয়াছিলেন, তিনি তাঁহাকে অসাধারণ করিয়াই নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। দান-কার্য্য চলিতে লাগিল; ডান হাত দান করে, বাঁ হাত খবর পায় না। দিন নাই, ক্ষণ নাই, যোগ্য নাই, অযোগ্য নাই—প্রসারিত হস্ত দেখিলেই চিত্তরঞ্জনের দক্ষিণ হস্ত আপনি প্রসারিত হইত। একথা বলিলে খুব বেশী বলা হইবে না যে, বাঙ্গালা দেশে এমন লোক নাই যিনি চিত্তরঞ্জনের কাছে হাত পাতিয়া রিক্তহস্ত ও শূন্যহৃদয় বহিয়া ফিরিয়াছেন। মহাভারতে পড়ি, কর্ণের প্রতিজ্ঞা ছিল, প্রত্যাশী কখন তাঁহার দ্বারে আসিয়া ফিরিবে না। আমাদের বাঙ্গালী দাতা-কর্ণের সেইরূপ কোন প্রতিজ্ঞা ছিল কি না বলিতে পারি না; তবে কেহ যে সত্যই ফিরে নাই, তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়।

কিন্তু, ইহাতে নূতনত্ব কিছু নাই—এই মহদ্‌গুণের কথা বাঙ্গালী মাত্রেই সত্য বলিয়া জানেন, শুনিয়াছেন, এখনও শুনিতেছেন। তবে, হয়ত চিত্তরঞ্জনের অবসানের সঙ্গেই এ সকল গৌরবময় কথা গাথায় পরিণত হইয়া যাইবে। এত বড় প্রাণ কি বাঙলায় আর আছে ?

চিত্তরঞ্জন কি ভাবে দান করিতেন, তাহা অনেকেই জানেন না। পদ্ধতিতে নূতনত্ব ছিল, অসাধারণত্ব ছিল। একদিনের একটী ঘটনা আমি জানি ; সেই কথাই আজ বলিতেছি।

১৯১১ কি ১২ সাল। প্রাতঃকাল। সম্ভবতঃ শনিবার। এক ঘর লোক বসিয়া আছেন : আজ তাঁহাদের অনেকেই দেশে ও দশে প্রতিষ্ঠাবান্। দীন লেখকও সেই বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর মধ্যে ভাগ্যবশে উপবিষ্ট। চুরুটের ধোঁয়ায়, হাস্যকলরবে, কক্ষ সরগরম। এই সময়ে ছিন্ন ও জীর্ণ-বসন-পরিহিত কৃশকায় এক বালক নগ্নপদে অতি সন্তর্পণে কক্ষ-আস্তরণে পা দিয়া—ঢুকিল। চিত্তরঞ্জনের প্রফুল্ল উজ্জ্বল দৃষ্টি তৎক্ষণাৎ সেইদিকে পড়িল। চিত্তরঞ্জন ডাকিলেন, "কি হে ছোক্‌রা ? এ-দিকে এস !" বালকের পিছনে দ্বারান্তরালে থাকিয়া যে একখানি বঙ্গ-বিধবার ভূষণ-শূন্য শীর্ণ হস্ত বালককে ধরিয়া ছিল, তাহা দেখা গেল ; বালক সে হাত ছাড়াইয়া অতি ভয়ে-ভয়ে, কম্পিত-বক্ষে, ততোধিক বিকম্পিত-পদে অগ্রসর হইল।

মুখে কেহ কিছু প্রকাশ না করিলেও, সেই বয়সে, আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিলাম, গৃহস্বামী ব্যতিরেকে প্রায় সকলেই প্রভাত-বৈঠকের মাঝে এই 'উপদ্রব' দর্শনে প্রীত

হন্ নাই। কাহার কাহার মুখ-চোখের ভাবে তাহা সুস্পষ্টও হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু চিত্তরঞ্জন একেবারে অন্য মানুষ! দৃষ্টি বন্ধু-বান্ধবদের পানে নাই; মনও 'বৈঠক' ছাড়িয়া সেই কুণ্ঠিত-পদ, কম্পিত-বক্ষ কৃশদেহ বালকের অন্তর-প্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়া কি-যেন অন্বেষণ করিতেছে। বালক চেয়ারের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়া—যেন ভয়ে, যেন লজ্জায়, শঙ্কায় মরমে মরিয়া যাইতেছিল। তাহার দুই চক্ষু ছল-ছল করিতেছে, ওষ্ঠাধর দু'খানি কাঁপিতেছে কিন্তু নীরব। চিত্তরঞ্জনের মধুর কণ্ঠস্বরে ধ্বনিত হইল—"কি চাও—বল?" এই মধুর, সঙ্গীতময় অভয় কণ্ঠস্বর শুনিবার সৌভাগ্য যাঁহাদের হইয়াছে, তাঁহাদের আর বলিতে হইবে না, যে-কোন মানুষকে সে স্বর কত কাছে টানিত, কত আপনার করিত! বালক কিন্তু তবুও মুখ খুলিতে পারিল না; আবার সেই অভয় কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হইল—"ভয় কি, বল!" এবার বালক সত্যই নির্ভয় হইল, কথা বলিল। কিন্তু তাহার "মা দাঁড়িয়ে আছে আর আমার বোনের বিয়ে"—এইটুকু ছাড়া আর একটি বর্ণও আমরা কেহ শুনিতে পাইলাম না; চিত্তরঞ্জনও বোধ হয় শুনিতে পান নাই কিন্তু তাহার প্রয়োজনও ছিল না। তিনি জিজ্ঞাসিলেন "কত টাকার জন্যে আট্‌কেছে বল্‌লে?" বালক বলিল, ভয়ে ভয়ে —"একশ টাকা!"

চিত্তরঞ্জন কাগজের টুকরায় কি লিখিয়া, ভাঁজ করিয়া, মুড়িয়া একজনকে ডাকিয়া টুক্‌রাটি দিলেন; বালককে বলিলেন—"ওর সঙ্গে যাও।" কত দিলেন, কোন খোঁজ না লইয়া কেন দিলেন, এ সমুদয় প্রশ্ন দর্শকদের মনে জাগিলেও মুখে আসিল না; বালক

চলিয়া গেল। কিন্তু কিছুক্ষণ যেন বৈঠক আর জমিল না—সব চুপ্-চাপ্! একজন ব্যারিষ্টার প্রথম স্তব্ধতা ভঙ্গ করিলেন। সেই সময়েই বালক একখানি নোট হাতে আবার দরজায় দেখা দিল! একখানা নোট বটে—কিন্তু 'একশ টাকারই!'

বালক সাশ্রুনয়নে বলিতে গেল "মা বল্লে"—চিত্তরঞ্জন স্নেহ-মধুর স্বরে বলিলেন—"হয়েছে! হয়েছে! তোমার বোনের বিয়ে হয়ে গেলে, আমাকে বলে যেও—বুঝ্‌লে!"—আত্মপ্রশংসা শ্রবণের স্পৃহা অনেকের না থাকিতে পারে কিন্তু কৃতজ্ঞতাটুকুও যেন তাঁহার প্রাপ্য ছিল না! যেন সে তাঁহার কর্ত্তব্য! কর্ত্তব্যের জন্য আবার কৃতজ্ঞতা গ্রহণের প্রয়োজন কি!

মহাভারতে এক দাতার কাহিনী পড়িয়াছি, আর স্বচক্ষে, আপনার জীবনে এক দাতার কার্য্য দেখিয়াছি। অনেক সময় ভাবি, কাহিনী বড় না প্রত্যক্ষ যা দেখিয়াছি, তাহাই বড়।

আজ মনে পড়িতেছে, সেই কাগজের টুক্‌রাটি দিবার সময় সেটিকে ভাঁজ করিয়া মুড়িয়া দেওয়ার কথা,—উপস্থিত ব্যক্তিগণ কেহ না দেখিতে পান্, তাহাই দাতার ইচ্ছা ছিল; বালক পুনরায় কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ করিতে না আসিলে, চিত্তরঞ্জন তাহাকে কত দিয়াছেন কেহই জানিতে পারিত না। আজ মনে পড়িতেছে, বালক নোট হাতে বাহির হইয়া যাইবামাত্র উপস্থিত বন্ধুগণের নজর যখন চিত্তরঞ্জনের উপর নিবদ্ধ, চিত্তরঞ্জন পূর্ব্ব প্রসঙ্গ উঠাইয়া, ঘটনাটাকে চাপা দিবার জন্য হঠাৎ কথা পাড়িলেন—"সমাজপতি (৺সুরেশ) আমার 'মালঞ্চের' একটা ভাল এডিসন কর্‌ছে......" সে কথাটা তখনকার মত চাপা পড়িল বটে কিন্তু

যাঁহারা সেইদিন সেইমুহূর্ত্তে সেইখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা কোন কালেই সেটিকে চাপা দিতে পারিয়াছেন কি? কত আবর্জ্জনা, কত ঘটনা ত জমিয়াছে কিন্তু সেই-দেখা সেই-দৃশ্য চাপা পড়িয়াছে কি? আমি ত তাঁহাদেরই একজন,—আমার ত কৈ চাপা পড়ে নাই; মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত পড়িবেও না।

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার।

(৫)

দান অনেকে করে, কিন্তু কেহ নামের জন্য, কেহ পুণ্যার্জ্জনের নিমিত্ত, কেহ বা ভবিষ্যতের আশায়। নিঃস্বার্থ দান জগতে অতি বিরল। নীরবে দান, অহমিকাশূন্য দান, অজ্ঞাত দান, যিনি করিতে পারেন, তিনি প্রকৃতই মহাপুরুষ। মহানুভব চিত্তরঞ্জনের দান ঐরূপই ছিল। শুধু তাহাই নহে, চিত্তরঞ্জনের চরিত্র এমন মধুময় যে কেহ তাঁহার দানের কথা উল্লেখ করিলে বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে প্রয়াসী হইলে, তিনি অতিশয় সঙ্কোচ অনুভব করিতেন। কতদিকে কতভাবে যে তিনি দান করিয়া গিয়াছেন তাহার সকল কাহিনী সংগ্রহ করা অসম্ভব। তথাপি এসম্বন্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে যিনি যাহা জানেন, তাহা প্রকাশ করিলে ভাল হয়। তদ্দারা ভবিষ্যতে চিত্তরঞ্জনের চরিত্র-লেখক সবিশেষ উপকৃত হইবেন।

চিত্তরঞ্জন আইন-ব্যবসায়ে অজস্র অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সেই উপার্জ্জিত অর্থ কেবল নিঃশেষে দান করিয়া ক্ষান্ত

হন নাই, পরিশেষে এজন্য তিনি ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

সাংসারিক হিসাবে লাভ ক্ষতির গণনায় তাঁহার চরিত্রের এ দুর্ব্বলতা স্বীকার করিয়া লইলেও, ইহা যে ধর্ম্মাভিমুখী ছিল, কে তাহা অস্বীকার করিবে? দানে তাঁহার অমিত ব্যয় পরের জন্য ও দেশের নিমিত্ত, ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য নহে, একথা যেন আমরা বিস্মৃত না হই। তিনি রাখিয়া ঢাকিয়া কাজ করিতে পারিতেন না, আপনাকে সম্পূর্ণভাবে বিলাইয়া দিতে না পারিলে যেন তাঁহার তৃপ্তি হইত না। এই উদার ভাবই ছিল তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব।

এই কথাই তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক থাকিত যে, বিধাতার কৃপায় তাঁহার উপার্জ্জিত অর্থ, তাঁহার নহে, ইহা সর্ব্বসাধারণের। তিনি যেন তাহার রক্ষকমাত্র। তাহাদের প্রয়োজনে ইহার সদ্ব্যবহার না হইলে, ইহার কিছুমাত্র সার্থকতা নাই। অর্থের নিজের কোন মূল্য নাই। পরার্থে প্রয়োগ করিতে পারিলেই ইহার মূল্য। এই কারণেই গৃহী চিত্তরঞ্জন সর্ব্বস্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইতে পারিয়াছিলেন।

আমি এস্থলে চিত্তরঞ্জনের দুইটি আখ্যায়িকার বিবরণ দিব, যদিও ইহার কোনটিও আমার প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট নহে, তথাপি প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট হইতে আমি শুনিয়াছি, সুতরাং ইহা অতিরঞ্জিত নহে।

(ক)

যখন ডুমরাওন রাজের প্রসিদ্ধ মোকদ্দমা উপলক্ষে চিত্তরঞ্জন তথায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, ইহা সেই সময়ের কথা। তখন রাজকোষ হইতে তাঁহার বিপুল অর্থাগম হইতেছিল, কিন্তু সেই অর্থ কিরূপে ব্যয়িত হইত, তাহা শুনুন।

গোবিনবাবু* বলিয়াছেন যে তিনি প্রত্যহ দেখিতেন যে সকালবেলা ৮টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত চিত্তরঞ্জন ক্রমাগত চেক্ কাটিতেন। কৌতূহলী হইয়া অনুসন্ধানে জানিতে পারেন যে ঐ সকল চেক ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র প্রেরিত হইতেছে—মান্দ্রাজ, বোম্বাই, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, বেহার, বাংলা, পাঞ্জাব, কোথায়ও বাদ নাই। কাহারও রেলভাড়া আবশ্যক, কাহারও ঋণ পরিশোধ না হইলে আর উপায় নাই, কাহারও দুঃস্থ সংসার কোনরূপে চলে না, কাহারও পরীক্ষার ফি, কাহারও বা স্কুল-কলেজের বেতন চাই, কেহ বা অনূঢ়া কন্যার বিবাহে বিব্রত, কোথায়ও বা স্কুল বা লাইব্রেরীর জন্য অর্থের প্রয়োজন এইরূপভাবে নানাবিধ প্রার্থনা তাঁহাকে নিরন্তর পূরণ করিতে হইত।

গোবিনবাবু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "আচ্ছা এই যে অসংখ্য প্রার্থী আপনার নিকট হইতে অর্থ লইতেছে, ইহারা কি সকলেই সাধু? আমার বিশ্বাস আপনার উদারতার প্রশ্রয় লইয়া কত লোক আপনাকে ঠকাইতেছে।" চিত্তরঞ্জন হাসিয়া বলেন, "আমি জানি ইহার মধ্যে কতলোক

(ক)-চিহ্নিত গল্পটি ডুমরাওন রাজের প্রাইভেট্ সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত গোবিনলাল* মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে লেখক-কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

ঠকাইয়া লইতেছে, কিন্তু ইহাও সত্য বেশীর ভাগ লোক প্রকৃত অভাবগ্রস্ত। সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। আমি যদি প্রত্যেক ক্ষেত্রে দানের উপযুক্ত পাত্র বাছাই করিতে বসি, তাহা হইলে আমার দান করা চলে না।” এইরূপ মহতী বাণী আমি জীবনে কখনও শুনি নাই।

(খ)

একদিন প্রভাতে ইন্দুবাবু* একটি মক্কেল লইয়া চিত্তরঞ্জনের ভবানীপুরের বাড়ীতে গিয়া দেখিলেন যে তখন চিত্তরঞ্জন নীচে নামেন নাই। সত্বরই আসিবেন শুনিয়া তিনি তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি আসিলেন। মোকদ্দমা-সংক্রান্ত কিছু কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। ঐ ঘরের প্রান্তে একটি বিধবা বসিয়াছিলেন। সেদিকে তাঁহার দৃষ্টিপাত হইলে, তিনি তাঁহার মোহরারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “উনি কি চান?” মোহরার বলিল, “উনি আপনাকে বলিবেন।” চিত্তরঞ্জন তাঁহাকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, “আপনি কি চান?”

রমণী—“দেখুন, আপনার নাম শুনিয়া রাণাঘাটের নিকট একটি ক্ষুদ্র গ্রাম হইতে আমি আসিয়াছি। শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে একেবারে বরাবর আপনার বাড়ীতে আসিয়াছি। আমি বড়ই বিপন্ন। আমার আত্মীয়-স্বজন কেহ নাই। আমার একটীমাত্র কন্যা। পাত্র স্থির হইয়াছে, বিবাহের দিনও

(খ) চিহ্নিতটী হাইকোর্টের বেঞ্চ ক্লার্ক শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ* বসু মহাশয়ের নিকট হইতে লেখক-কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

সংক্ষেপ। অন্ততঃ পক্ষে হাজার টাকা না হইলে পছন্দমত পাত্রটি হাতছাড়া হয়। কিন্তু টাকা কোথায়, আমি একেবারে নিরুপায়।"

চিত্তরঞ্জন—"যদি একটি বিষয়ে আপনি মত করেন, তাহা হইলে এ সাহায্য করিতে আমি প্রস্তুত আছি।"

রমণী—"কি ?"

চিত্তরঞ্জন—"যখন আপনার আত্মীয়-স্বজন কেহ নাই তখন আমার লোক গিয়া বিবাহ দিয়া আসিবে, যাহা ব্যয় হয়, তাহার ভার আমার উপর রহিল।"

রমণী সাশ্রুনেত্রে তাঁহার পদতলে পড়িলেন। চিত্তরঞ্জন কুণ্ঠিতভাবে বলিয়া উঠিলেন "কি করেন ? কি করেন ?" এই বলিয়া ত্বরিতভাবে তাঁহার পদযুগল সরাইয়া লইলেন।

বলা বাহুল্য, চিত্তরঞ্জন কথামত নিজের লোক পাঠাইয়া বিবাহের সকল বন্দোবস্ত ও ব্যবস্থা করিলেন। সুশৃঙ্খলে বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইল। ইহাতে তাঁহার দুই সহস্রেরও অধিক টাকা ব্যয় করিতে হয়।

শ্রীজ্ঞানরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

(৬)

চিত্তরঞ্জন ভবানীপুরের এল্. এম্. এস্. ইনষ্টিটিউশনে শিক্ষারম্ভ করেন। এই স্থানেই বর্ণ-পরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া এণ্ট্রান্স্ পাশ করেন। ইংরাজ কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বলিয়াছেন—Child is father of the man. ছেলেবেলা হইতেই চিত্তরঞ্জনের মহত্ত্বের আভাস পাওয়া গিয়াছিল। তাঁহার বর্ণ-

পরিচয়ের শিক্ষক আজও জীবিত। তাঁহার মুখে চিত্তরঞ্জনের বাল্যজীবনের কয়েকটি ঘটনা শুনিয়া বড়ই তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। একটী ঘটনার এই স্থানে উল্লেখ করিব।

তখন চিত্তরঞ্জনের বয়স সাত কিংবা আট বৎসর। জল-খাবারের জন্য তাঁহার পিতার নিকট চিত্তরঞ্জন চারিটী পয়সা পাইতেন ও প্রায় প্রত্যেক দিন সেই পয়সা হইতে অন্যান্য বালকদের খাওয়াইতেন ও নিজেও খাইতেন। একদিন তিনি বাড়ী ফিরিয়া গেলে তাঁহার পিতা পুত্রের শুষ্কমুখ দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর বালক চিত্তরঞ্জন বলিলেন, সেইদিন একটী অতি গরীব বালক ভাত না খাইয়া স্কুলে আসিয়াছিল। সেইজন্য তিনি নিজে না খাইয়া তাহাকে চার পয়সার জলখাবার খাওয়াইয়া-ছিলেন। চিত্তরঞ্জনের পিতা পুত্রের এই স্বার্থত্যাগের বিষয় শুনিয়া তাঁহাকে কোলে টানিয়া লইয়া কত আদর করিলেন। বাল্যকালে এই প্রকার স্বভাবের পরিচয় যিনি দিয়াছিলেন, তিনি বড় হইলে যে মহাপ্রাণ হইবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি!

শ্রীসুধীরকুমার চট্টোপাধ্যায়।

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ

## একাগ্রতা

১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের জুন মাস—একদিন চিত্তরঞ্জন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পরদিন রবিবারে আমার কোনও বিশেষ কাজ আছে কি না। কাজ থাকিলেও আমি জানাইলাম যে, প্রয়োজন হইলে আমি আসিতে পারিব। প্রসন্নমুখে তিনি বলিলেন যে, দ্বিপ্রহরে নিরালায় তিনি তাঁহার রচিত কাব্য পড়িয়া আমাকে শুনাইবেন।

পরদিন যথাসময়ে আসিয়া দেখিলাম, তিনি বাহিরের ঘরে একা বসিয়া আছেন। ধূমপান চিত্তরঞ্জনের একটা প্রধান বিলাস ছিল। ধূমপান শেষ হইলে তিনি 'কিশোর-কিশোরী' ও 'অন্তর্যামী' আনাইলেন। এই দুইখানি তাঁহার শেষের দিকের রচনা। স্তব্ধ মধ্যাহ্নে কক্ষমধ্যে মাত্র আমরা দুই জন। চিত্তরঞ্জন ভৃত্যকে বলিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার কাছে কেহ কোন কার্য্যে আসিলে যেন অন্য ঘরে অপেক্ষা করেন।

কাব্যপাঠ চলিল। তাঁহার আবৃত্তির ভঙ্গী অত্যন্ত সুন্দর—কণ্ঠস্বর সুমধুর। কবি আপনার রচনা পড়িতে পড়িতে যেন অন্যলোকে প্রয়াণ করিলেন; আমিও তন্ময় হইয়া শুনিতে লাগিলাম। পূর্ব্বে অনেকবার তাঁহার কাব্যগুলি পড়িয়াছিলাম; কিন্তু সে দিন তাঁহার কণ্ঠে যে সুরের ঝঙ্কার ও ভাবের প্রবাহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা চিরদিন আমার স্মরণ থাকিবে।

'কিশোর-কিশোরী' ও 'অন্তর্যামী' পূর্ব্বে আমার খুবই ভাল লাগিয়াছিল ; কিন্তু সে দিন বোধ হইয়াছিল, ভক্ত সাধক ব্যতীত অন্যের লেখনী হইতে এমন পীযূষধারা নির্গত হইতে পারে না।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিবার পূর্ব্বেই বই দুইখানি সমাপ্ত হইল। কবি চিত্তরঞ্জনের সৌম্য আনন, প্রতিভা-দীপ্ত ললাট ও শান্ত নয়নে সে দিন যে পরিতৃপ্ত শান্তির আলো দেখিয়াছিলাম, তাহা কখনও ভুলিব না। ভাবের আতিশয্যে মাঝে মাঝে তাঁহার কণ্ঠ ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তখনই বুঝিয়াছিলাম, তিনি যে সত্যের সন্ধানে ঘুরিতেছিলেন, তাহার শুধু সন্ধানই পান নাই, জীবনে তিনি সে সত্যের উপলব্ধি করিয়াছেন। বৈষ্ণব চিত্তরঞ্জন চণ্ডিদাসের মতই চির-ভাস্বর, নিত্য প্রেম ও আনন্দময় রাজ্যের প্রেমিক সম্রাটের সান্নিধ্য লাভ করিয়া পবিত্র হইয়াছেন।

ভৃত্য অভ্যাসমত মাঝে মাঝে কলিকা বদ্‌লাইয়া দিয়া যাইতেছিল ; কিন্তু তাম্রকূটসেবনানুরাগী চিত্তরঞ্জনের সে দিকে খেয়ালই ছিল না। প্রকৃত কবি, ভক্ত ও প্রেমিক না হইলে এমন বাহ্যচেতনাশূন্য হওয়া যায় না। তখন তাঁহার কাছে বোধ হয় সংসারের আর সকল বিষয়ই লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তিনি যখনই যাহা করিতেন, এমনই আত্মবিস্মৃত হইয়া কায়মনঃপ্রাণে তাহাতে নিমগ্ন হইয়া যাইতেন। চারিদিকে দৃষ্টি রাখিয়া, লাভ-লোকসান খতাইয়া সাধারণ মানুষের মত কোন কাজই তিনি করিতে পারিতেন না। এইখানেই তাঁহার বিরাট বৈশিষ্ট্য।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

## উৎসাহ ও একাগ্রতা

আমি তখন চাঁদপুরে। তথায় তখন প্রবল আন্দোলন ও চাঞ্চল্য। ষ্টীমারের কর্ম্মচারীদিগের ধর্ম্মঘট চলিতেছে। চা-বাগানের কুলীদের উপর অনাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার ন্যায্য বিচার করিতে হইবে, নতুবা কর্ম্মচারারা কাজে ফিরিয়া যাইবেন না; এই সংবাদ দেশবন্ধুর নিকট প্রেরিত হইয়াছে। চা-বাগানের কুলীদের বেদনার করুণ কাহিনী দেশবন্ধুর মনকে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি স্বয়ং ঘটনাস্থলে আসিবেন বলিয়া জানাইলেন। আমরা কিন্তু এই সংবাদে চিন্তিত হইয়া পড়িলাম।

তখন ঘোর বর্ষা। পদ্মাবক্ষে উত্তালতরঙ্গমালা তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে। সচরাচর যে ষ্টীমারগুলি গোয়ালন্দ হইতে চাঁদপুর যাতায়াত করে, সেগুলি এমন দিনে অনেক সময় বিপদে পড়ে শুনা গিয়াছিল। তাহার উপরে এই ধর্ম্মঘটের দিনে ষ্টীমারের অভাবে দেশীয় ক্ষুদ্র নৌকায় আসা যে কতদূর বিপজ্জনক,—জীবনকে কত তুচ্ছ ভাবিলে যে এইরূপ বিপদকে আলিঙ্গন করা যায়, বর্ষায় পদ্মার রুদ্র মূর্ত্তি যে দর্শন করিয়াছে, সে-ই তাহা বুঝিতে পারে। কিন্তু কোন বিপদ, কোন ভয় দেশবন্ধুকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। অনেক বন্ধুবান্ধব তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলেন,—"দুই এক দিন অপেক্ষা করুন।"

বন্ধুবান্ধবের শত অনুরোধ উপরোধ উপেক্ষা করিয়া, জীবনের সমস্ত ভয়-ভাবনা ত্যাগ করিয়া দেশবন্ধু সামান্য একখানি নৌকায় আরোহণ করিয়া চাঁদপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। আমরা সকলে উদ্বিগ্নচিত্তে চাঁদপুরে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। তিনি যে দিন ক্লান্তদেহে চাঁদপুরে আসিয়া উঠিলেন, সে দিন সকলেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলাম। দরিদ্র-নারায়ণের সেবার জন্য তাঁহার এতটা উৎসাহ, এতটা একাগ্রতা দেখিয়া শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে সে দিন তাঁহার চরণে হৃদয় লুটাইয়া দিয়াছিলাম।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত।

# সপ্তম পরিচ্ছেদ

## ত্যাগ ও অনাসক্তি

যখন দেশবন্ধু বৎসরে লক্ষ লক্ষ টাকা আয় ও ব্যবসায়ে অতুল প্রতিপত্তি হেলায় বিসর্জ্জন দিয়া পথে দাঁড়াইলেন, তখন লোকে বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া বলিল—“কি ত্যাগ!” বাস্তবিক বর্ত্তমানকালে এতখানি টাকার মায়া এ দেশে বা অন্য দেশে এত সহজে কেহ ছাড়িতে পারিয়াছেন কি না, জানি না—অন্ততঃ মনে ত পড়ে না। কিন্তু তবু আমি এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি যে, ঠিক ত্যাগ বলিলে দেশবন্ধুর মহত্ত্বের স্বরূপ আমরা বুঝিতে পারিব না।

· যাহা কাম্য, ঈপ্সিত, বাঞ্ছনীয়, যাহা বাসনা ও সাধনার সামগ্রী, তাহার ত্যাগই ত্যাগ এবং সাধারণতঃ আমরা এমনই টাকার কাঙ্গাল যে, সেই জন্য টাকার ত্যাগই একমাত্র ত্যাগ বলিয়া মনে করি। ইহা কেবল আমাদের হৃদয়ের দৈন্য ও সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক। আর কিছুই নহে। কিন্তু এই স্থানেই ছিল দেশবন্ধুর বৈশিষ্ট্য। তিনি টাকার দিকে কখন দৃক্‌পাত পর্য্যন্তও করেন নাই। অজস্র টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন সত্য—কিন্তু সে টাকাকে কখনও ধূলিমুষ্টির অপেক্ষা মূল্যবান্ জ্ঞান .করেন নাই—টাকার উপর তাহার কোনও দিন একটা দরদ বসে নাই। ইহা সকলের পক্ষেই গৌরবের কথা—দেশবন্ধুর

পক্ষে আরও গৌরবের কথা। কারণ, সচরাচর দেখা যায় যে, যাঁহারা দারিদ্র্যের সহিত ভীষণ সংগ্রাম করিয়া ঐশ্বর্য্যে উপনীত হইয়াছেন, টাকাটা তাঁহাদের কাছে বেশী বড় হইয়া দাঁড়ায়।

দেশবন্ধু দরিদ্রের সন্তান বা দারিদ্র্যে পালিত, এ কথা কেহ বলিতে পারেন না। কিন্তু নানা কারণে তাঁহাকে ঘোর অবস্থা-বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া যাইতে হইয়াছিল। তিনি এক দিন আমাদের কাছে গল্প করিয়াছিলেন যে, ব্যবসায়ের প্রথম প্রথম হাইকোর্টের পর তিনি হাঁটিয়া ভবানীপুরের বাসা পর্য্যন্ত যাইতেন—ব্যায়ামের জন্য নহে, ট্রামের ছয় পয়সা ভাড়া বাঁচাইবার জন্য। এমন ভীষণ দারিদ্র্যের অবস্থা কাটাইয়া যিনি মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকা রোজগার করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে টাকার মায়া করা স্বাভাবিক—কিন্তু দেশবন্ধুর কোন দিন তাহা হয় নাই।

অনেকে লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, দেশবন্ধু সহজে টাকা স্পর্শ করিতে চাহিতেন না। খুলনায় মামলা করিতে গিয়াছেন—এক-সঙ্গে পঁচিশ হাজার টাকা দেওয়া হইল। কিন্তু এত টাকার দিকে একবার ফিরিয়াও তাকাইলেন না। বেণী খানসামা টাকা গণিয়া লইল, তাহার কাছেই টাকা এবং টাকার বাক্সের চাবি রহিল—দেশবন্ধু তাহার খোঁজও করিলেন না। একবার দুইবার নহে, বহুবার এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

তাই বলিতেছিলাম, যে লোকের নিকট টাকা এতটা তুচ্ছ ও অসার বলিয়া পরিগণিত হইত, তাঁহার পক্ষে টাকার ত্যাগটাই বড় ত্যাগ বলিয়া মনে করিলে মানুষটিকে ভুল বুঝা হইবে—

কবি চিত্তরঞ্জন

ডুমরাঁও রাজের মামলার সময়ে ( ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ )

তাঁহার মহত্ত্বের অবমাননা করা হইবে। বহু দিনের অভ্যস্ত নেশার সামগ্রীগুলি তিনি যে এক মুহূর্ত্তে ছাড়িয়া দিলেন, আর জীবনে এক দিনের তরেও স্পর্শ করিলেন না— আমার মনে হয়, টাকার অপেক্ষা ইহাই দেশবন্ধুর পক্ষে বড় ত্যাগ; আর দেশবন্ধুও সেইরূপ অনুভব করিতেন। ব্যারিষ্টারী সম্বন্ধেও সেই কথা। ব্যবসায়ের এত বড় আয় ছাড়িয়া দিয়াছি, এ কথা কখনও তাঁহার মনে আসিত কি না, জানি না; কিন্তু ব্যারিষ্টারীতে তাঁহার যে অতুল যশ, প্রতিপত্তি ও প্রভুত্ব ছিল, এক মুহূর্ত্তে তাহাকে অবহেলায় প্রত্যাখ্যান করা বাস্তবিকই তাঁহার পক্ষে টাকার অপেক্ষা বড় ত্যাগের ব্যাপার।

এক দিনের কথা বেশ মনে পড়িতেছে। রাজদ্রোহের জন্য 'অমৃতবাজার পত্রিকার' বিরুদ্ধে গভর্ণমেণ্ট মামলা করিয়াছেন। জ্যাক্সন, নর্টন, চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বড় বড় ব্যারিষ্টার 'অমৃত-বাজারের' পক্ষ হইয়া লড়িলেন, কিন্তু কেহই কিছু করিতে পারিলেন বলিয়া মনে হইল না। চীফ জষ্টিসের ঘর বড় বড় উকীল, ব্যারিষ্টার, এটর্ণিতে পরিপূর্ণ, তিলধারণের স্থান নাই। সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া শুনিতেছেন—সকলেই ভাবিতেছেন, জজেদের মনে কোনও ইম্‌প্রেসন হয় নাই (দাগ বসে নাই), বরং উল্টা উৎপত্তি হইয়াছে। মিস্টার জ্যাক্সন রাগ করিয়া চীফ জষ্টিস্‌কে দুই একটা কড়া কড়া কথা শুনাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। সকলেই মনে করিলেন, মোকদ্দমার দফা শেষ হইল।

অবশেষে চিত্তরঞ্জন উঠিলেন; লোক চিত্রার্পিত, মন্ত্রমুগ্ধের

মত তাঁহার কথা শুনিতে লাগিল; অপূর্ব্ব কৌশলের সহিত তিনি সরকারপক্ষের মামলা বিশ্লেষণ করিয়া তাহার অসারতা প্রতিপন্ন করিতে লাগিলেন; মোকদ্দমার চেহারা বদ্‌লাইয়া গেল; একটা গভীর ধন্যবাদে লোকের অন্তঃকরণ পূর্ণ হইয়া উঠিল। দুইটার সময় জজেরা উঠিয়া গেলেন, চিত্তরঞ্জন বাহিরে আসিলেন। চীফ জষ্টিসের কাছারীঘর হইতে বার্ লাইব্রেরী পর্য্যন্ত সমস্ত বারান্দায় লোকের ভিড় লাগিয়া রহিয়াছে। লোক সসম্ভ্রমে দুই দিকে কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া মধ্যে পথ করিয়া দিল, বিজয়ী বীরের মত তিনি চলিয়া আসিলেন। সুতরাং তাঁহার পক্ষে ব্যারিষ্টারী-জীবনের এই যে বিজয়োল্লাসের গর্ব্ব, এই যে প্রচুর ও প্রভূত সম্মান ও গৌরব, ইহা ছাড়িয়া আসিতে বাস্তবিকই কিছু ক্লেশ হইয়া থাকিতে পারে —টাকা ছাড়িতে কিছুমাত্র হয় নাই।

স্বীকার করি যে, এই সম্মান ও গৌরবের লক্ষ গুণ প্রতিদান তিনি পরে দেশবাসীর নিকট পাইয়াছিলেন। কিন্তু পাইব বলিয়া ত ছাড়েন নাই—ছাড়িয়াছিলেন নিজের চিত্তের একটা অসাধারণ প্রাচুর্য্য ও বিশালতা ছিল বলিয়া। কিছু রাখিয়া ঢাকিয়া করিতে দেশবন্ধু জানিতেন না—নিজেকে নিঃশেষে বিতরণ করিয়া দেওয়া ছিল তাঁহার স্বভাবের ধর্ম্ম। নিজের জন্য কিছু পুঁজি রাখিয়া তিনি কোন কাজে লাগিতে পারিতেন না—একেবারে পুঁজি শেষ করিয়া লাগিয়া যাইতেন। কংগ্রেস হউক, কাউন্সিল হউক, মোকদ্দমা হউক, কোন কাজেই দুই আনা হাতে রাখিয়া চৌদ্দ আনা কাজে লাগাইয়া তিনি সন্তুষ্ট

হইতে পারিতেন না। ষোল আনা ছাড়াইয়া আঠার আনা না দিতে পারিলে, তাঁহার চিত্তের বিশালতা যেন ভরিয়া উঠিত না—অন্তরে যেন অপূর্ণতা থাকিয়া যাইত। এই যে নিজেকে নিঃশেষে বিতরণ—সমগ্র আত্মা ও মনের অকুন্ঠিত ও অবারিত দান—ইহাই ছিল চিত্ত-চরিত্রের বৈশিষ্টা। টাকার দানটা ইহারই একটা অকিঞ্চিৎকর প্রকারভেদমাত্র।

শ্রীজিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

## অষ্টম পরিচ্ছেদ

### উদারতা ও ভালবাসা

(১)

তাঁহার উদারতা কথায় বলিয়া বুঝাইতে পারিব না, এ অনুভবের জিনিষ। একদিন জেলখানায় অসুস্থ হইয়া বিছানায় শুইয়া আছেন, আমি কাছে বসিয়া আছি, এমন সময়ে বাহিরের একটী ভদ্রলোক দেখিতে আসিলেন। ভদ্রলোকটী কি একটা হিসাব দেখাইয়া বলিলেন, "আমি একটা হিসাব এনেছি, হিসাবটা একবার দেখ্‌বেন না ?" তিনি উত্তর করেন "হিসাব আর কি দেখ্‌বো, আমার মনে হয়, আমি যা দিয়েছি, তুমি তার চেয়ে বেশী করেছ"। এই তাঁহার মহানুভবতা, অথচ আমরা শুনিয়াছিলাম সেই ভদ্রলোকটীর হাত দিয়া অনেক টাকার আদান-প্রদান হইয়াছিল।

বাস্তবিক টাকার সম্বন্ধে তাঁহার কখনও কোন হিসাব ছিল না। একদিন কথাচ্ছলে বলিলেন, অমুক আসিয়া দুই তিন দিন বলিল, "পৈত্রিক বাড়ীখানি নিলাম হয়ে যাবে, ভাই চিত্ত, এই টাকাটা দিয়ে তুমি বাড়ীখানি রক্ষা কর।" তাই আমি ২৫০০০৲ পঁচিশ হাজার টাকার একখানি চেক্‌ দিয়াছিলাম।

মাসিক সাহায্য তিনি কত লোককে করিতেন তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রাক্‌টিস্‌ ছাড়িবার পরেও দুই তিনমাস সেই সমস্ত টাকা দিয়াছিলেন। আমি যতদূর জানি ঐ সমস্ত লোকের মধ্যে একজন ভদ্রলোক ১৫০৲ পাইতেন, আর একজন মাসিক ৭৫৲ পাইতেন। ঢাকায় অবস্থানকালে ঋণ করিতেন, তথাপি কাহাকেও প্রত্যাখ্যান করিতেন না।

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত।

(২)

আমি তাঁর প্রায় সমবয়সী ছিলাম, তিনি ছিলেন বছর কয়েকের বড়। সাহিত্য, তা ছাড়া আরো অনেক বিষয়ে তিনি আমার সঙ্গে আলোচনা করতেন।

তাঁর চরিত্রের আরো বিবিধ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সবচেয়ে বড় দুটো জিনিষ আমি দেখেচি। অর্থের সম্বন্ধে তাঁর কোনও মোহ ছিল না,—মনে তাঁর ভয়ানক বৈরাগ্য ছিল—সুপাত্রে, অপাত্রে, কুপাত্রে, তিনি অজস্র দান করে গেছেন।

আর একটা বড় জিনিস, দেশের প্রতি তাঁর সত্যিকার দরদ ছিল, বাস্তবিকই তিনি দেশকে বড় ভালবেসেছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি বল্‌তেন, আমার মত বুকের মধ্যে জ্বালা না হ'লে লোকের মধ্যে কাজ করতে পার্‌বেন না।

বাংলাদেশের লোকের প্রতি তাঁর অফুরন্ত স্নেহ, অনন্ত বিশ্বাস ছিল। কংগ্রেসের কাজে দেশের লোক টাকা দেয় না বলে একবার তাঁর কাছে অনুযোগ করি, তাতে তিনি বলেছিলেন,

দেশের লোক টাকা দেয় না! অজস্র টাকা দেয়! কেবল আমরা চাইতে জানি না। আপনি কি বলেন দেশের লোক আমাদের ভালবাসে না?

দেশের লোকে তাঁকে ভালবাসে, তাঁকে সাহায্য করবে এ তাঁর অটল বিশ্বাস ছিল। সবচেয়ে বড় জিনিস তাঁর মধ্যে যা' আমি লক্ষ্য করেছিলাম, তা' হচ্ছে এই—দেশের লোকের প্রতি তাঁর অদ্ভুত স্নেহ, অপূর্ব্ব ভালবাসা।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

# নবম পরিচ্ছেদ

## সংযম-অভ্যাস

### (১)

ডুম্‌রাওন কেস্‌ লইয়া চিত্তরঞ্জন তখন প্রায়ই ছাপ্‌রায় থাকিতেন। আমার একবার সেখানে যাইবার কথা হইল। কি কারণে যাওয়া হইল না মনে নাই। ব্রেণ্‌ ফিভার হওয়াতে চিত্তরঞ্জন কলিকাতায় আসিলেন। আমরা গেলে আমাদের একেবারে নিজের শোয়ার ঘরে ডাকিয়া বিছানায় বসিতে বলিলেন। দেওঘরের নিকট রিখিয়া গ্রামে চিত্তরঞ্জন বহু সহস্র বিঘা জমি বন্দোবস্ত লইয়াছিলেন। সেখানে একটা আশ্রমগোচের কিছু করা যায় কিনা এবং আমি তাহার ভার লইতে পারি কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। ঠিক হইল, আমরা দেওঘর যাইব এবং স্থানটা দেখিয়া আসিয়া স্থির করিব। কয়েক মাস পরে যাওয়া হইয়াছিল।

ঐদিন চিত্তরঞ্জন আমাদের বলিতেছিলেন, "দেখ, প্র্যাকটিস্‌ কর্‌তে গেলে দেশের কাজ করা চলে না। এ বছর পাঁচ লাখ টাকা রোজগার কর্‌লাম, কিন্তু একটা পয়সাও থাকে না; দেশের কাজ তেমন কিছুই কর্‌তে পার্‌লাম না। আমার কতকগুলো

দেনা রয়েছে, ঐ গুলো শোধ হ’য়ে গেলেই ব্যবসা ছেড়ে সম্পূর্ণ-ভাবে দেশের কাজে লাগ্‌বো। কিন্তু বছরের পর বছর যাচ্ছে ঋণ আমার বেড়েই চলেছে। নিজের জন্য ভাবি না—কষ্ট কি, প্রথম জীবনেই দেখেছি। ট্রামের ভাড়া বাঁচাবার জন্যে হাইকোর্ট থেকে বিকেলে ফের্‌বার সময় হেঁটে এসেছি এবং এমন দিনও গেছে যেদিন হয়তো দুই আনা বই পরিবারের সম্বল ছিল না। আর যদি দশ বছরই বাঁচি, প্র্যাক্‌টিস্ ছাড়লেও একরকম ক’রে সুখে দুঃখে যাবে, কিন্তু একটা কেবল ভাবনা হয়, অনেকগুলো লোক আমার কাছে মাসিক সাহায্য পায়; সে বেচারাদের কি হবে? যাই হোক্, এত না ভেবে ঝাঁপিয়ে না পড়্‌লে হবে না। তোমরা এ সম্বন্ধে কি বল?”

আমরা উত্তর করিলাম, “অনন্যকর্ম্মা হ’য়ে দেশসেবায় না নাম্‌লে দেশের বিশেষ কিছু করা যাবে না।”

মিউনিশন বোর্ডের কেস্ ও ডুমরাওন কেস্ করিতে তিনি প্রতিশ্রুত ছিলেন, কিন্তু দেশের কাজ হইয়া উঠিবে না বলিয়া তিনি এগুলিও ছাড়িয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। পুলিশের অন্যতম কর্ত্তা আর্মষ্ট্রং সাহেবের জিদে মিউনিশন বোর্ডের মামলা চিত্তরঞ্জনের হাতে আসে; কারণ অন্য কোনও ব্যারিষ্টারের উপর গভর্ণমেণ্টেরও এত বিশ্বাস ছিল না।

এই মামলার কাগজপত্র দেখিবার ‘ফি’ তিনি ৫০ হাজার টাকা পাইয়াছিলেন। যে দিন এই মামলা ফেরৎ দেওয়ার কথা হয়, তখন আমি ঘরে বসিয়াছিলাম। গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে বোধ হয় ডিরেক্টর অব ইন্‌ডাষ্ট্রীস্ মীক্ সাহেব আসিয়াছিলেন।

মামলাটি হাতে রাখিবার জন্য, তিনি কত অনুরোধ করিলেন। চিত্তরঞ্জন হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"আট লাখ টাকা দিয়া গবর্ণমেণ্ট আমায় বাঁধিয়া রাখিতে চান, এতে তো গবর্ণমেণ্টের মহা লাভ। আপনারা অন্য ব্যারিষ্টারের চেষ্টা দেখুন, না পাইলে অবশ্য আমি তো প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছিই, কিন্তু আমাকে পরিত্রাণ দেওয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।" আমার যতদূর মনে আছে, তিনি সবশুদ্ধ প্রায় ষোল লাখ টাকার ব্রিফ্ ফেরৎ দিয়াছিলেন। নিজের ঘাড়ে এত দেনা থাকিতে শুধু দেশের সেবার অবসর করিতে তিনি টাকার দিক্ দিয়া কি বিপুল ত্যাগই না করিয়াছিলেন!

তিনি টাকাকে অপদেবতা বলিতেন! একদিন সিলেটের অন্তর্গত শ্রীমঙ্গল ষ্টেশনে তিনি আধুলি, সিকি, দুয়ানির চেহারা লইয়া কত না কৌতূহল দেখাইয়াছিলেন এবং শ্রীমতী বাসন্তী দেবীকে ডাকিয়া দেখাইয়াছিলেন আজ কাল ঐ সকল মুদ্রার চেহারা কিরূপ হইয়া গিয়াছে। চিত্তরঞ্জন ও বাসন্তী দেবীর সেইদিন বাল-সুলভ কৌতূহল দেখিয়া আমি অবাক্ হইয়াছিলাম।

চিত্তরঞ্জন বলিতেন "লোকে আমার প্র্যাকটিস্ ত্যাগের প্রশংসা করে, কিন্তু প্র্যাকটিস্ ত্যাগ করিতে আমার বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় নাই, এতদিনের এত অভ্যাস একটা ছাড়িতেও আমার তেমন কষ্ট হয় নাই, যত কষ্ট হইয়াছিল তামাক ছাড়িতে।"

প্র্যাক্টিস্ ছাড়ার পূর্ব্বে কি কি জিনিস না হইলে তাঁহার চলিবে না তাহার একটা তালিকা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে তামাক একটা প্রধান জিনিস ছিল। তামাক ছাড়িয়া চিত্তরঞ্জনের

পেটের অবস্থা খারাপ হয়, এজন্য তিনি কিছুকাল নিরামিষ খাইতেন। তখন তাঁহার মেজাজটা যে কি রুক্ষম হইয়াছিল আমার বেশ মনে আছে। সকল কথায় চটিয়া উঠিতেন এবং কোথাও কাহাকে তামাক খাইতে দেখিলে সতৃষ্ণ-নয়নে চাহিয়া মুখ ফিরাইয়া লইতেন।

শ্রীহেমন্তকুমার সরকার।

( ২ )

ইদানীং তিনি দেশ ছাড়া আর কিছুই ভাবিতে পারিতেন না। তিনি শেষবার কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বে টালিগঞ্জে মাসিক কুড়ি টাকা ভাড়ায় একখানি খোলার ঘর নিজের জন্য ভাড়া করিতে একজন বন্ধুকে চিঠি লিখিয়াছিলেন। এই কথা শুনিয়া তাঁহার আকৈশোর বন্ধু মহাপ্রাণ এটর্ণী শ্রীযুত প্রমথনাথ কর মহাশয় দুঃখ করিয়া দার্জ্জিলিঙ্‌এ তাঁহাকে পত্র দেন। তিনি লেখেন যে তাঁহাকে প্রমথবাবুর বিশপ-লিফ্রয় রোডের বাড়ীতে আসিয়া থাকিতে হইবে। চিত্তরঞ্জন প্রমথবাবুকে জানান যে, তিনি ঐ বাড়ীতে গিয়া উঠিলে উহার সমস্ত ইংরাজ অধিবাসীরা হয়ত উঠিয়া যাইবে ও ইহাতে প্রমথবাবুর বিশেষ অর্থনাশ হইবে। কিন্তু বন্ধুপ্রাণ প্রমথবাবু দেশবন্ধুকে ছাড়িলেন না। অবশেষে দেশবন্ধুকে ঐ বাড়ীতেই আসিতে হইল।

তিনি ব্যারিষ্টারী ছাড়িয়া দিয়া দুধ খাইতেন না, সুকোমল শয্যায় শয়ন করিতেন না,—জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, “যাহাদের দুধ যোগাইতাম, তাহারা দুধ না খাইয়া মরিবে, আর

আমি দুধ খাইব ?” শেষ জীবনে তিনি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হইয়াছিলেন।

পুরাণে কথিত আছে, শ্মশানবাসী মহাদেব মৃত্যুকে জয় করিয়া অমর হইয়াছিলেন। এই স্বার্থান্ধ যুগে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনও মৃত্যুকে বরণ করিয়া অমর হইয়াছেন।

শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়।

## দশম পরিচ্ছেদ

### অমায়িকতা ও সহৃদয়তা

তিন চারি বৎসর পূর্ব্বে একবার দেওঘর যাইবার সময় যশিদি জংসনে শুনিলাম দেশবন্ধু আমাদের ট্রেণেই কলিকাতা হইতে যশিদি জংসনে নামিয়াছেন, তিনি রিখিয়া যাইবেন। বন্ধুরা আমায় সুবিধাবাদী বলেন, সুতরাং আশ্চর্য্য নয়, আমার লোভ হইবে এই সুযোগে একবার মহাপুরুষ দর্শন করা। প্লাটফর্ম্মে দেখিলাম, এটর্ণি শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ দত্ত মহাশয়। তিনি আমাকে চিনিতেন। তাঁহার নিকট মনোভাব জ্ঞাপন করিতে তিনি আমাকে যত্ন করিয়া দেশবন্ধুর নিকট লইয়া গেলেন। আমি সেখানে গিয়া দেশবন্ধুর চরণধূলি মস্তকে লইলাম। দেশবন্ধু একটু বিব্রত হইয়া আমাকে হাত ধরিয়া তুলিয়া পাশে বসাইলেন। কত বড় দেবতুল্য মহাপুরুষের পাশে বসিবার সৌভাগ্য ও গৌরব আমি সেদিন লাভ করিয়াছিলাম! সেদিন প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছিলাম, কত উচ্চের নিকট কত নগণ্য তুচ্ছের সমাবেশ হইয়াছে। সাহস কিন্তু আমার অপ্রতুল ছিল না। দু'একটী কথা কহিবার প্রলোভন সেই সুবিধায় আমি সংবরণ করিতে পারি নাই। তাঁহার অমায়িকতার অন্তরালে বসিয়া আমি দু'একটী প্রশ্ন তাঁহাকে করিয়াছিলাম। আমি নগণ্য বলিয়া, উপেক্ষা করার পরিবর্ত্তে, তিনি আমার প্রত্যেক কথাটী আমাকে ভাল করিয়া

বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি না হইতে পারে মনে করিয়া, দু'একটী প্রশ্নোত্তর যথাসম্ভব স্মরণ করিয়া নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম—

আমি। আপনারা সকলকে চরকা ব্যবহার করতে পরামর্শ দিচ্ছেন। একটী লোকে চরকা কেটে কত টাকা উপার্জ্জন করবে যা'তে তার দিন গুজরাণ হ'তে পারে ?

দেশবন্ধু। চরকা কাটা যদি কেহ উপজীবিকা ব'লে গ্রহণ করেন, তা' হ'লে মাসিক কুড়ি, পঁচিশ টাকাও হ'তে পারে।

আমি। তা' হ'লে এই মাগ্‌গি গণ্ডার দিনে, ঐ সামান্য টাকায় তাঁর চল্‌বে কি করে ?

দেশবন্ধু। চালায় কে জানেন! আপনি না আমি, না ভগবান্ ? যিনি যেদিন থেকে চরকা-কাটা জীবিকার্জ্জনের পন্থা-স্বরূপ করে নেবেন, সেইদিন থেকে তাঁর বিলাসিতা-ব্যসনগুলি আপনা হ'তেই খসে পড়্‌বে। শাকভাত আর মোটা কাপড়ে সন্তুষ্ট হ'তে পার্‌লে আমাদের দিন গুজরাণ হ'তে আর লাগে কি ? ততটা ত্যাগ বাঙ্গালী বর্ত্তমানে করতে না পার্‌লেও অবসর সময় অর্থাৎ যখন তাস-দাবা-পাশা নিয়ে কিংবা পরনিন্দা-পরচর্চ্চায় অপব্যয়িত হয়, সেই সময়টুকু চরকায় অর্পণ কর্‌লে মাসিক আট, দশ টাকা উপার্জ্জন হওয়া তো বেশী কথা নয়। নিজের মাসিক বাঁধা আয়ের উপর এই উপরি-পাওনাটুকু কত কাজের তা কি বুঝ্‌ছেন না ?

আমি সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িলে, তিনি পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন—"লজিক, লজিক করে দেশের লোক পাগল।

এখন এই লজিককেই আমি অত্যন্ত ভয় করি। আগে কার্য্যক্ষেত্রে না নেবে হিসাবখতানটুকু আমাদের স্বভাব-সিদ্ধ, তাই লজিক ছেড়ে দেওয়া এখন আমাদের পক্ষে কল্যাণকর। রাস্তার ধারে পেন্সিল খেলনা বিক্রী ক'রে, আলুপটলের ব্যবসা থেকে আরম্ভ ক'রে আমাদের দেশে কত মাড়োয়ারী লক্ষপতি হয়েছেন, তা'তো আমরা চোখে দেখেও শিখি না।"

আমি বলিলাম, মাড়োয়ারীদের সঙ্গে আমাদের ব্যয়েরও যে তুলনা হয় না। যেখানে চার পয়সার ছাতু খাইয়া একজন দরিদ্র মাড়োয়ারীর দিন চলিবে, সেখানে বাঙ্গালীর অন্ততঃ আট আনা খরচা হবেই।

দেশবন্ধু। আমিও ত তাই প্রথমে বলেছি, খরচা কমাও, বিলাসিতা বর্জ্জন কর; সাদাসিদে ভাবে চল, দেখ্‌বে আমাদেরও দিন ফির্‌বে।

এই সময়ে দেশবন্ধুর গাড়ী আসিলে, আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উঠিলাম, তিনিও হাসিমুখে আমাকে বিদায় দিলেন, যেন আমি তাঁর কত দিনের পরিচিত!

শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র।

(২)

বোধ হয় ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে বেলুড়মঠে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উৎসবোপলক্ষে স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ ঘৃত বাবদ আড়াই শত টাকা সংগ্রহ করিতে আমাকে আদেশ করেন; আমি প্রথমে কোনও একজন হিন্দুধর্ম্মানুরাগী সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিস্টারের নিকট যাই, তিনি পঞ্চাশ টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন। পরে আমি শ্রীযুত চিত্তরঞ্জনের নিকট গিয়া বলিতেই তিনি বলেন, "কত টাকা তুলেছ?" আমি বলিলাম "কোন সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার পঞ্চাশ টাকা দিয়েছেন।" তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "তোমায় আর কোথাও যেতে হ'বে না—বাকী দুই শত টাকা আমি দিব।" এই সংবাদ শুনিয়া মঠের স্বামীজিরা অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং তাঁহাকে মঠে উপস্থিত হইয়া মহোৎসবে যোগদান করিতে স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ আমাকে অনুরোধ করিতে বলেন। আমি যখন প্রথমে তাঁহাকে স্বামীজিদের অনুরোধ জানাই তখন তিনি বলেন, "শুনেছি সেখানে বেজায় ভিড় হয়। অত ভিড়ে যাওয়া আমার পোষাবে না। অন্য দিন না হয় সপরিবারে গিয়ে দেখে আস্‌বো—কি বল?"

উত্তরে আমি বলিয়াছিলাম, "আপনি না জনসাধারণের সঙ্গে মিশ্‌তে চান—তবে ভিড় দেখে ভয় পেলে চল্‌বে কেন? যেখানে হাজার হাজার লোক এক ভাবের প্রেরণায় ও উন্মাদনায় সম্মিলিত হয়—যে নিরক্ষর মহাপুরুষের আবির্ভাবে বাংলা দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার মধ্যেও প্রাচীন সনাতন আদর্শ প্রতিষ্ঠা হ'চ্চে এবং যাঁর সাধনার বাণী স্বামী বিবেকানন্দ বজ্র-নির্ঘোষে

জগতে প্রচার ক'রেছেন—বাংলা দেশের যুবকবৃন্দকে সেবা-ধর্ম্মে মাতিয়েছেন—শুধু ভিড়ের ভয়ে তাঁর লীলাভূমিতে যাবেন না? দেশের একটা অপূর্ব্ব ভাবের দৃশ্য দেখ্‌বেন না? চিত্তরঞ্জন আর দ্বিরুক্তি না করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা—আমি যদি মেয়েদের নিয়ে উৎসবের পূর্ব্বদিন গিয়ে পরদিন উৎসব দেখে সন্ধ্যাকালে চ'লে আসি, তবে আমাদের জন্য আলাদা একটা নিরিবিলি স্থানের ব্যবস্থা কি হ'তে পারে? তুমি মঠে স্বামীজিদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে আমাকে সংবাদ দিবে।" মঠের স্বামীজিরা ও স্বামী প্রেমানন্দজি ইহা শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন এবং মঠের উত্তর পার্শ্বের যে বাগান-বাড়ী পূর্ব্বেই মহোৎসবোপলক্ষে তাঁহারা ভক্তগণের থাকিবার জন্য বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন—এক্ষণে তাহাতে উহা শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জনের থাকিবার ব্যবস্থা করিলেন। আমি এই সংবাদ দিলে চিত্তরঞ্জন বলিলেন, "তবে নিশ্চয়ই যাব।"

উৎসবের পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে বেশ এক পসলা বৃষ্টি হইতেছে এমন সময়ে চিত্তরঞ্জন মোটরে বেলুড় মঠে আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে ছিল শ্রীযুত গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ও একজন আরদালী। মঠের পার্শ্ববর্ত্তী বাগান-বাড়ীতে তাঁহাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। তাঁহার কন্যার শরীর অসুস্থ বলিয়া তিনি মেয়েদের লইয়া আসিলেন না—ইহা তিনি স্বামী প্রেমানন্দজিকে বলিলেন।

দেশবন্ধু ও শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী
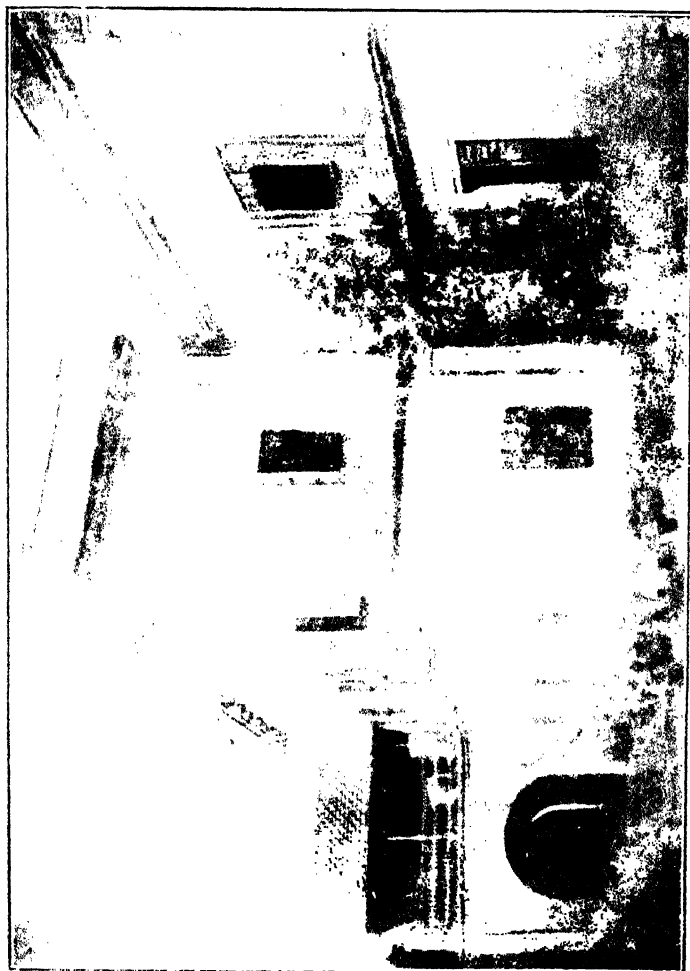
# দেশবন্ধু-কথা

## পদ্যাংশ

### চিত্তরঞ্জন

দেশের প্রাণ দেশের ত্রাতা
তোমার পায়ে নমস্কার!
দেশের তরে প্রাণটা দিলে
এই যে তোমার পুরস্কার!

২

জ্ঞান দেছ ভক্তি দেছ
শক্তি দেছ আপনার,
অর্থ দেছ স্বার্থ দেছ
দেছ জীবন-অন্ন-ভার;

দিতেই তুমি জন্মেছিলে
কলির দাতাকর্ণ হে!
প্রতিদান ত চাহিলে না
প্রাণটা ছিল পূর্ণ যে!

৪

পতিতেরি বন্ধু ছিলে
আত্মভোলা মহাপ্রাণ !
দুঃখ তাদের বইলে বুকে—
সেই যে ছিল ধ্যান-জ্ঞান !

৫

বঙ্গনারীর অজ্ঞানতায়
কেঁদেছিল তোমার প্রাণ,
জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে দিতে
যা কিছু সব কল্লে দান !

৬

'নারী-কর্ম্ম-মন্দিরে'র
ছিলে প্রধান ঋত্বিক্ !
প্রতিজ্ঞাতে ভীষ্ম ছিলে
অটল দৃঢ় নির্ভীক্ !

৭

তোমার স্মৃতির পানে চাহি'
বহে চক্ষে অশ্রু-ধার ;
স্বর্গে থাকি লহ আজি
দীনার ক্ষুদ্র শ্রদ্ধা ভার !

শ্রীরেণুকাবালা মুখোপাধ্যায়

# শোকোচ্ছ্বাস

কোথা গেল বল আজি সেই প্রিয় ফুল,
যাহার সুবাসে মুগ্ধ বঙ্গবাসিকুল।
চিত্তের রঞ্জন আহা সে চিত্তরঞ্জন!
আঁধারিয়া চিত্ত-ভূমি কোথায় এখন?

কে হেন নিঠুর চোর হরিল সে নিধি,
হায় রে মোদের প্রতি বাম বড় বিধি।
হে আষাঢ়! তুমিও যে ফেল নেত্র-জল,
যার লাগি মোরা কাঁদি হইয়া বিহ্বল।

এ জগতে প্রিয়জনে ক্ষণ দরশন,
নীহারের শোভা নাহি রহে সর্বক্ষণ।
হে দেশবান্ধব, তুমি দেশহিত তরে,
জনমিলে অবতার এ বঙ্গ-ভিতরে।

জননী জন্মভূমি কে বুঝিবে আর,
সর্বস্ব করিবে ত্যাগ চরণে তাহার?
অদম্য উৎসাহভরা প্রফুল্ল অন্তর,
নবীন যুবক সম কার্য্যেতে তৎপর।

কি ছার সাম্রাজ্য-পতি লভে সে কি মান!
তোমার অক্ষয়-কীর্ত্তি রবে দীপ্যমান।

হে রাজর্ষি! বঙ্গহৃদে তুমি অধীশ্বর,
বল্কল বসন তব স্বদেশী খদ্দর।

বঙ্গের পবিত্র ধূলি বিভূতি সমান,
দেশবাসী প্রতি তব ভ্রাতৃ-সম জ্ঞান।
স্বার্থত্যাগ মহামন্ত্র করেছ সাধন,
স্বদেশ-মঙ্গলে ত্যজি নশ্বর জীবন,
দিয়াছ স্বর্নীতিপূর্ণ দৃঢ় অস্থি তব,
যাহাতে গঠিত বঙ্গ হবে অভিনব।

**শ্রীপদ্মলোচন ভট্টাচার্য্য কবিশঙ্খ, (নারিট)**

# চিত্ত-শোকে

ভেঙ্গে গেছে হৃদি-বীণা, আর কি তুলিবে তান,
চারিদিকে ব্যাকুলতা ভারত-গগন ম্লান।
স্বর্গসুখ পরিহরি মরতে মুরতি ধরি—
ভারত-চিত্তরঞ্জন বাঙ্গালী জাতির মান।
দেশসেবা-তরুমূলে, ধন-মান সমর্পিলে,
ভিখারী সাজিয়ে পরে ত্যজিলে আপন প্রাণ,
(সেই) অপূর্ব্ব ত্যাগেরি ধারা বুঝিতে নারিনু মোরা
অভিমানে বিভু-পাদে লভিলে চরম স্থান।

শ্রীঅতুলানন্দ বক্সী

## দেশ-চিত্ত

চিত্তের রঞ্জন লাগি জনম তোমার ;
লক্ষ কোটী চিত্ত ভরে করি অন্ধকার,
কোথায় লুকালে বন্ধু ? দেশবন্ধু তুমি !
তোমার অভাবে কাঁদে তব জন্মভূমি !
যেদিন প্রথম তুমি কাঙ্গালের বেশে—
দৈন্যের স্বরূপ সাজি ফের দেশে দেশে ;
মনে হ'ল, ওই বুঝি নদীয়ার গুরু,
আবার লীলার ছলে—লীলা করে সুরু !
দরিদ্রে সেবিলে তুমি নারায়ণ জ্ঞানে—
দরিদ্র তাই তো তোমা নারায়ণ জানে !
যেথায় বাসনা তব, সেথা তুমি যাও—
নিখিল প্রণতি, পদে—নিতি নিতি পাও !
সর্ব্বেশ-আশিস্ ধরি মুকুটের প্রায়,
আবার জনম নিও বাঙ্গালার পায় !

মহারাজ-কুমার শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায়

## অর্ঘ্য

হায়, চির-ভোলা হিমালয় হ'তে
অমৃত আনিতে গিয়া,
ফিরিয়া এলে যে নীলকণ্ঠের
মৃত্যু গরল পিয়া।
কেন এত ভালবেসেছিলে তুমি
এই ধরণীর ধূলি,
দেবতারা তাই দামামা বাজায়ে,
স্বর্গে লইল তুলি।
ধরণী আর তোমা ধরিতে পারে না,
আজ তুমি দেবতার,
নিয়া যাও দেব মরু-জগলার
অশ্রু নয়নাসার।

কাজী নজরুল ইসলাম

## দেশবন্ধু

চিনিবে কি দেশ-বন্ধু তোমা বঙ্গজনে ?
ছিলে কি মহার্হ রত্ন তুমি এ ভারতে !
এ কোন্ অমৃত-ফল কল্পের কাননে,
কোন্ সাধনার মহাশক্তি এ জগতে !
আচরিলে কোন্ ব্রত কোন্ জন্মান্তরে,
এ মর্ত্ত্যে করিলে যার মহা উদ্‌যাপন ;
যার সমুজ্জ্বল জ্যোতিঃ যুগ-যুগান্তরে,
বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হ'য়ে নিরখে ভুবন।
কে ছিল তোমার সম বিপুল মহান্,
দরিদ্র-দেশের বন্ধু ! বিশ্বে কি অতুল,
দেশ-হিতে সর্ব্বত্যাগ—মহা আত্মদান,
দারুণ দুর্দ্দিনে চির-অকূলের কূল !
সমগ্র দেশের দীপ্তি গিয়াছে নিবিয়া,
বহে কি শোকেব বন্যা ধরণী প্লাবিয়া !

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম, কবিভূষণ, কবিশেখর

এইখানে দেশবন্ধুর দেহ দাহ করা হইয়াছিল

# চিত্তচিতা

১
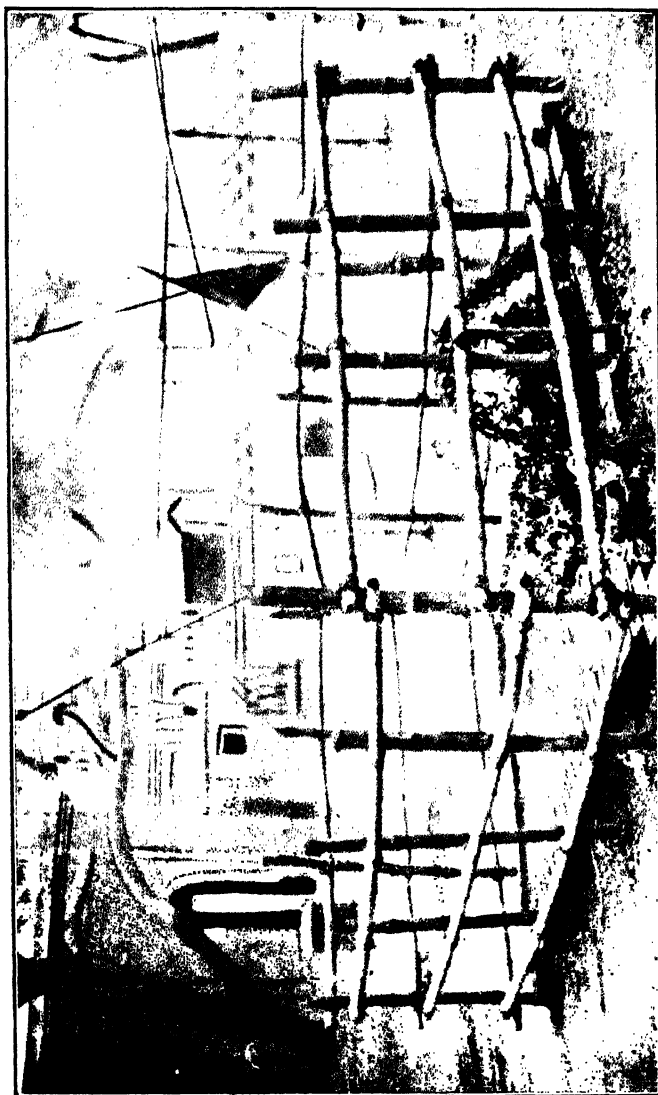
অরুন্তুদ কি যে ব্যথা মোরে আজ করে দেয় মূক
বক্ষ রাখে অশ্রু চাপি, রহি তাই বন্দন-বিমুখ।
ভাষা নাহি খুঁজে পাই, ভাব যায় হারাইয়া শোকে,
মুখরে নীরব দেখি, কত কথা বলে' যায় লোকে।

২

গৌরবের গৌরীশৃঙ্গ আশুতোষ পড়ে যবে ধ্বসি,
কহি নাই কোনো কথা, মুহ্যমান একা ছিনু বসি।
ভাবরাজ্যে ভূকম্পন গুঞ্জরণ দেয় ভোলাইয়া,
শোকের মৈশুমী বয়, মানসের তল ঘোলাইয়া।

৩

আজিকে আবার সেই সম্মুখেতে শোকের পাথার,
কালের অশনিপাতে হৈমগিরি হল চুরমার।
অহিংসার বোধিদ্রুম, ত্যাগের নীরব নিরঞ্জনা,
সম্মুখে শুকায়ে গেল চক্ষে মোর নাহি অশ্রুকণা।

৪

ঊর্জ্জস্বল জ্যোতিরাত্মা নয়ন ঝলসি দেয় মোর,
দেখিতে পাইনা ছায়া, উড়ে মরি বিহগ ফাঁফর।
চঞ্চল প্লাবন যেন দশ দিক্ দেয় মগ্ন করি,
বক্ষের মৃণাল ভাঙ্গে শতদল উঠে না মঞ্জরি।

৫

বিত্তহারা 'চিত্ত' সে যে বিধাতার অপার্থিব দান,
ফাল্গুনীর সৌম্য দেহে দধীচির ধ্যানমগ্ন প্রাণ।
তারে গড়েছিল বিধি মিশাইয়া অমৃত বিদ্যুতে
মণিকর্ণিকার ঘাট—জীব শিব, জীবনে মৃত্যুতে।

৬

'মালঞ্চ' ঝলসি' গেল, থেমে গেল 'সাগরসঙ্গীত',
গাণ্ডীবী মূর্চ্ছিত রথে এ কাহার করাল ইঙ্গিত ?
যায় নীলচক্র দেখা, রথের যে দেরী নাই, আর,
অনন্ত পথের যাত্রী কোথা তুমি ? ডাকি বারবার।

৭

তুমি কবি, তুমি ধ্যানী, দৃষ্টি তব সৃষ্টি পারে যায়,
বর্ত্তমান সাঁতারিয়া ভবিষ্যের সুমেরু ছায়ায়।
তুমি গরুড়ের মত চিরদিন অমৃতসন্ধানী,
হৃদয় কৌপীন পরা, দীনতা-কৌলিন্যে অভিমানী।

তোমার উদার বক্ষে মিশেছিল হিন্দু মুসল্‌মানে
দেখা দিত আকবর প্রতাপ ও জয়মল সনে।
অসি আর বাঁশী তুমি মিলাইলে পরাইয়া রাখী,
না দেখি ইদের চাঁদ, হে ফকির, তুমি দিলে ফাঁকি !

তোমার যা কিছু ছিল সব তুমি ত্যজেছিলে ত্যাগী,
দেশবন্ধু সর্ব্বহারা নিঃস্ব তুমি স্বদেশের লাগি।
ছিল শুধু স্নিগ্ধ শান্ত, ভীমকান্ত প্রাণটুকু পুঁজি
'বিশ্বজিতে' পূর্ণাহুতি তাও আজ দিয়ে গেলে বুঝি!

১০

বিশ্বাসী বৈষ্ণব তুমি, বংশীরব দংশিয়াছে কাণে,
প্রেমের শ্রীবৃন্দাবনে চলিয়াছ কাহার সন্ধানে?
ভীতির শৃঙ্খল ভাঙ্গে, ভাঙ্গে যে কংসের কারাগার,
সে আজ দিয়েছে ডাক, মৃত্যু—কি মিলন অভিসার!

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

## শ্রদ্ধাঞ্জলি

শ্মশানেতে সব শেষ ?—সেত মিথ্যা ভয়,
        শ্মশানেরি না মানি' শাসন,
মৃত্যুরণে জীবনের নিত্য পরাজয় ?
        মরণের না মানি' বারণ,
যুগে যুগে দেশে দেশে হে অমর ! অম্লান ! অক্ষয় !
গাও স্বাধীনতা গান, গাও তুমি জীবনের জয় !
        গাও তুমি গীতি-চিরন্তন
        দেশবন্ধু হে চিত্তরঞ্জন !

মৃত্যু নিল পদধূলি ভৃত্য সম এসে :
        অনন্তের বিশ্রাম মন্দিরে
শ্রান্ত দেহখানি নিল বিস্মৃতির দেশে ;
        সে অক্লান্ত 'চিত্ত' হেথা ফিরে।
সঞ্চারে সে উন্মাদনা আত্মা মাঝে অশরীরী বেশে,
সর্ব্বত্যাগী সে তাপস দেশ-জননীরে ভালোবেসে,
        সে অনন্ত দেহমুক্ত মন :
        দেশপ্রেমী হে চিত্তরঞ্জন।

লক্ষ দেশবাসী বুকে তুমি নববল
        জীবনের তুমি যে জীবন,
ত্যাগব্রত হে আদর্শ পুণ্য সমুজ্জ্বল !
        ভয়হীন জ্বলন্ত যৌবন !

অজর অমর তুমি ! পুণ্য স্মৃতি পাথেয় সম্বল
নিবেদিলে দেশ-মায়ে জীবনের রক্তকমল
প্রণমিছে তব ভক্তগণ,
দেশপূজ্য হে চিত্তরঞ্জন

দেশ-আত্মা-বেদী পরে চিতা হোমশিখা
পুণ্য অগ্নি নিভিবে না কভু,
ক্ষুদ্র স্বার্থ ভস্ম হয়, যায় অহমিকা
জড়ে প্রাণ জেগে উঠে তবু।
দেশ-মাতা তব ভালে এঁকে দিল জ্যোতির্ময় টীকা,
ভারতের ইতিহাসে রবে নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখা।
দেশবাসী করিবে বন্দন;
মৃত্যুঞ্জয়ী হে চিত্তরঞ্জন !

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়

## দেশবন্ধু-বিয়োগে

নাই সে মরমী কবি মুক্তিকাম ধ্যানী,
পূজিত যে সর্ব্বজীবে নারায়ণ মানি'
নাহি সেই দাতাকর্ণ,—শেষ শ্বাস তাঁর
মিশেছে হিমাদ্রি-অঙ্কে,—রুদ্র হাহাকার
তিস্তার তুরন্ত স্রোতে ভেসে আসে হায়,
মগ্ন দেশ ব্যথা-ঝরা আষাঢ় ধারায় !
নবীন দধীচি যাও জয়মাল্য গলে,
দীপ্ত তব ললাটিকা যজ্ঞ হোমানলে ;
ভেদবুদ্ধি পরিহরি' নিখিল ভারতে
তুলিয়াছ জয়ধ্বজা একতার পথে।
কে হয়েছে সর্ব্বত্যাগী তোমার সমান ?
দেশবন্ধু, সত্যব্রত, হে দিব্য সন্তান !
মৃত্যুজয়ী আজি তুমি হে মুক্ত বৈষ্ণব,
লহ এ ভক্তের অর্ঘ্য হে মহামানব।

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যা

# শোকাশ্রু

নাহি 'সাগরের সঙ্গীত' আর
'মালঞ্চ' আজ সুরভিহীন ;
'কিশোর-কিশোরী' লুটায় ভূমিতে
কোথা সে কবির আনন্দ-বীণ্ ।

নর-নারায়ণে নিয়েছে গোপনে
দেব-নারায়ণ বুকেতে ধরে,
বরষার মেঘে ভুবন ভরিয়া
সে আজি অমরা উজল করে ।

কোথায় দেশের দরদী বন্ধু,
কোথা মমতার প্রস্রবণ ;
সোনার কাঠির জীয়ন-পরশে
কে আর জাগায়ে ভুলাবে মন !

স্বর্গলোকের নব জ্যোতিষ্ক,
হে আলোকপুঞ্জ মুক্তপ্রাণ ;
আজি শোকার্ত্ত মর্ত্ত্যলোকের
লহ অশ্রুর শ্রদ্ধা দান ।

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ

## মহাপ্রয়াণ

এনেছিলে সাথে করে
মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি
করি গেলে দান

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর